RIZON

কিশোর ক্লাসিক

আলেকজান্দার দ্যুমা-র

দ্য কর্সিকান ব্রাদার্স

ভাষান্তরঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এই পিডিএফটি BANGLAPDF.NET এর সৌজন্যে নির্মিত।

স্ক্যান+এডিটঃ আদনান আহমেদ রিজন
স্ক্যানের জন্যে বইটি দিয়েছেনঃ নাজিরুল বশির

পিডিএফ তৈরী করা হয় বইপ্রেমীদের সুবিধার জন্যে, যেন সবাই সহজেই বই পেতে,পড়তে,সংগ্রহে রাখতে পারে।
বইটি ভাল লাগলে অবশ্যই হার্ডকপি সংগ্রহ করুন। লেখক/প্রকাশককে ক্ষতিগ্রস্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

আপনারা অবশ্যই এই পিডিএফটি শেয়ার করুন, তবে BANGLAPDF.NET এর কার্টেসী ছাড়া শেয়ার না করার অনুরোধ রইল ।

হ্যাপি রিডিং... :)

কিশোর ক্লাসিক

আলেকজান্দার দ্যুমা'র

দ্য কর্সিকান ব্রাদার্স

রূপান্তর: কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রজাপতি প্রকাশন

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব: অনুবাদকের
প্রথম প্রকাশ
সেবা প্রকাশনী: ১৯৯৮
প্রজাপতি সংস্করণ: ২০০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ: ২০০৪
প্রচ্ছদ
হাসান খুরশীদ রুমী
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
প্রজাপতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M-M)
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com
একমাত্র পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

THE CORSICAN BROTHERS
By: Alexandre Duma
Trans by: Qazi Anwar Husain
ISBN 984-462-695-1
মূল্য: পঁয়তাল্লিশ টাকা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সাংবাদিক জাহ্নবী দাসের কাছে স্নেহভাজন আলীম আজিজের মাধ্যমে এ-কাহিনীতে উল্লিখিত সত্তর-আশিটি ফরাসী শব্দ লিখে পাঠিয়েছিলাম। অনেক কষ্ট স্বীকার করে, অনেক যত্নে তিনি প্রত্যেকটি শব্দের সঠিক ফরাসী উচ্চারণ দেখিয়ে দিয়ে আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। উভয়কেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

—অনুবাদক।

লেখক পরিচয়

আলেকজান্দার দ্যুমা (১৮০২-১৮৭০) ছিলেন এক-চতুর্থাংশ নিগ্রো ও তিন-চতুর্থাংশ ফ্রেঞ্চ।

তাঁর দাদী মেরী দ্যুমা ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের এক সুগার প্ল্যান্টেশনের নিগ্রো ক্রীতদাসী। বাবা ছিলেন নেপোলিয়নের অধীনে সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল। কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্যে তেমন কিছুই রেখে যেতে পারেননি। ফলে দ্যুমার শৈশব কেটেছে খুবই দুঃখ-কষ্টে। তবে এই সময় একজন দয়ালু যাজক তাঁকে কিছুটা লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন।

কিছুদিন একজন আইনজীবীর সঙ্গে থেকে তিনি আইন পাঠ করেন। তবে লেখালিখির ইচ্ছে তাঁকে শেষ পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে আসে প্যারিসে।

'হেনরী থ্রী' লিখে প্রথম তিনি সুনাম অর্জন করলেন। তারপর ছোট গল্প, উপন্যাস ও নাটক লিখে চললেন একের পর এক। ১৮৪৪ সালে, 'দ্য থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' তাঁকে এনে দিল প্রচুর অর্থ ও জগৎজোড়া খ্যাতি।

বই লিখে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। কিন্তু অতিশয় প্রমোদপ্রিয় ও অমিতব্যয়ী ছিলেন বলে শেষ বয়সে খুবই দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং কপর্দকশূন্য অবস্থায় মারা যান পুত্রের আশ্রয়ে।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

মার্চ মাস। কর্সিকায় এসেছি, গোটা দ্বীপ ঘুরে দেখব বলে। শুনেছি এ দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নাকি অতুলনীয়, সত্যি কিনা এবার নিজ চোখে এসেছি দেখতে।

তুলোঁ থেকে জাহাজে আজাসিও পৌঁছতে লাগে বিশ ঘণ্টা, বাস্তিয়ায় নামলে চব্বিশ ঘণ্টা। আমি নেমেছি বাস্তিয়া বন্দরে। নেমেই একশো ফ্রাঁ দিয়ে কিনে নিয়েছি একটা তরতাজা ঘোড়া।

'কোত' আর 'আজাসিও' দেখা হয়ে গেছে, এখন চলেছি সাখতান প্রদেশের মধ্যে দিয়ে সুলাকাখোর দিকে।

জানি, রাহাজানির ভয় নেই। পারিবারিক শত্রুতা থাকলে আলাদা কথা, সেক্ষেত্রে দশ কদম ফেলতেও ভয়; কিন্তু পর্যটককে কেউ কিছু বলবে না, গোটা দ্বীপের যেখানে খুশি ঘুরে-ফিরে দেখতে অসুবিধে নেই। রাতের থাকা-খাওয়াও কোনও সমস্যা নয়—যে-কোনও গ্রামে গিয়ে যে-কারও বাড়ির দরজায় টোকা দিলেই হলো, বেরিয়ে আসবে গৃহকর্তা বা কর্ত্রী, সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে নিয়ে যাবে, সাধ্যমত থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করবে, পরদিন সকালে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবে রাত্রিবাসের জন্যে তার বাড়িটিই পছন্দ করায়। টাকা-পয়সা কিছু দিতে চাইলে অপমান বোধ করবে। তবে হ্যাঁ, কিছু উপহার দিলে—একটা রুমাল বা একটা ছোরা—খুশি হয়ে গ্রহণ করবে, সবাইকে দেখাবে সে-উপহার গর্বের সঙ্গে। ফ্রান্সেরই একটা অঞ্চল হলেও, অবাক লাগে, কর্সিকান আচার-আচরণ ফরাসীদের থেকে একেবারেই আলাদা; এরা কথাও বলে আঞ্চলিক ইটালিয়ান ভাষায়।

সুলাকাখোর দিকে চলেছি। আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে পর্বতের মেরুদণ্ড ডিঙাতে হবে। যেন হারিয়ে না যাই, সেজন্যে সঙ্গে একজন গাইড নিয়েছি। মাইল তিরিশেক একটানা চলার পর বিকেল পাঁচটার দিকে বিশ্রাম নিতে থামলাম পাহাড়ের মাথায়। ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় ওলমেতো আর সুলাকাখো গ্রাম।

'কোথায় উঠবেন, ভেবেছেন কিছু?' জানতে চাইল গাইড।

গ্রামের দিকে তাকালাম। জনশূন্য রাস্তা, এক-আধজন মহিলাকে দেখলাম এদিক-ওদিক চকিত দৃষ্টি ফেলে ত্রস্তপায়ে হেঁটে যাচ্ছে। একশো-সোয়াশো বাড়ি দেখা যাচ্ছে গ্রামটায়। চারপাশে চোখ বুলিয়ে দুর্গের মত দেখতে একটা চারকোনা বাড়ি পছন্দ হলো। একটু অবাক হলাম দরজা-জানালায় বন্দুক চালানোর জন্যে ফুটো রয়েছে দেখে। তবে ইতোমধ্যে আমি জেনে গেছি এই এলাকা পারিবারিক কলহ ও বংশানুক্রমিক খুনোখুনির জন্যে কুখ্যাত।

তর্জনী তাক করে বাড়িটা দেখালাম।

'বেশ!' বলল আমার গাইড। 'তাহলে আমরা মাদাম সাভিলি দো ফ্রানশির বাড়িতে যাচ্ছি। আপনার পছন্দের তারিফ করতেই হয়।'

'তবে,' চট্ করে প্রশ্ন করলাম, 'কোনও মহিলার আতিথেয়তা চাওয়ায় কোনরকম অসুবিধে নেই তো?'

অবাক হলো গাইড। 'কেন, অসুবিধে কিসের?'

'না, মানে, মহিলা যদি অল্পবয়সী হন,' আমতা আমতা করে বললাম, 'তাঁর বাড়িতে রাত কাটালে আবার কোনও বদনাম টদনাম...'

'বদনাম?' আরও অবাক হলো গাইড, 'কেন? বদনাম হবে কেন?'

একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললাম, 'মহিলা তো বিধবাও হতে পারেন…'

'ঠিক ধরেছেন, মশিয়ে। মহিলা বিধবা।'

'তাহলে তিনি কি একজন যুবক মানুষকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করবেন?'

'যুবক মানুষকে?' আমার কথা বুঝতে পারছে না গাইড। 'আপনি বৃদ্ধ না যুবক—তাতে কী এসে যায়?'

বুঝলাম, এভাবে প্রশ্ন করে হবে না। সরাসরি জানতে চাইলাম, 'মাদাম সাভিলির বয়স কত?'

'এই…চল্লিশ মত হবে।'

'ও!' বললাম, 'তাহলে ঠিক আছে। ছেলেমেয়ে আছে নিশ্চয়ই?'

'ছেলে। চমৎকার দুই ছেলে।'

'এখানেই আছে?'

'একজন আছে মার সঙ্গে।'

'আরেকজন?'

'প্যারিসে থাকে।'

'বয়স কত ওদের?'

'একুশ।'

'দুজনেরই?'

'হ্যাঁ। যমজ ওরা।'

'আচ্ছা! করে কি?'

'প্যারিসে যে আছে সে আইন পড়ছে।'

'আরেকজন?'

'আরেকজন সত্যিকার কর্সিকান হিসেবে গড়ে উঠছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ। তাহলে মাদাম সাভিলি দো ফ্রানশির বাড়ির দিকেই যাওয়া যাক।'

দশ মিনিটেই পৌঁছে গেলাম হত-দরিদ্র গ্রামে। লক্ষ করলাম, প্রতিটি বাড়ির জানালা-দরজায় গোলাগুলির জন্যে ফোকর রয়েছে, প্রতিটি বাড়িই যেন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত। প্রত্যেক বাড়ির দেয়ালেই অসংখ্য বুলেটের দাগ দেখা যাচ্ছে। কোন কোন ফোকরে চোখ দেখতে পেলাম, ছেলে না মেয়ে বোঝা গেল না, তবে এটা ঠিক, গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমাদের গতিবিধি লক্ষ করা হচ্ছে।

আমরা যে বাড়িটির সামনে এসে দাঁড়ালাম, একবাক্যে বলা যায় সেটিই এ-গ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাড়ি। একবার টোকা দিতেই খুলে গেল দরজা, দাঁড়িয়ে আছে একজন উর্দি পরা ভৃত্য, কোমরে ঝুলছে একটা খাপে পোরা স্প্যানিশ নাইফ।

'সুলাকাখোতে কাউকে চিনি না আমি,' বললাম। 'আমি পর্যটক, এই বাড়িতে আশ্রয় প্রার্থনা করা কি অসঙ্গত হবে?'

'নিশ্চয়ই না, মশিয়ে,' বলল লোকটা। 'আপনাকে অতিথি হিসেবে পেলে এ-বাড়ির সবাই সম্মানিত বোধ করবে। মাখিয়া…' পিছনে দাঁড়ানো চাকরানীকে বলল, 'মাদাম সাভিলিকে বলো, একজন ফরাসী মুসাফির আশ্রয় চান।'

কথা শেষ করেই আট ধাপ খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে লোকটা আমার ঘোড়ার লাগাম ধরল। ঘোড়া থেকে নামলাম।

'জিনিসপত্র নিয়ে ভাববেন না, মশিয়ে, সব আপনার ঘরে পৌঁছে দেয়া হবে।'

খুশি হলাম এমন সহৃদয় অভ্যর্থনা পেয়ে।

দুই

উঁচু ধাপ বেয়ে ওপরে উঠে বাড়িতে ঢুকলাম। করিডরের শেষ মাথায় কালো কাপড় পরা, লম্বা, সুন্দরী এক মহিলার সামনে দাঁড়ালাম। বুঝলাম ইনিই গৃহকর্ত্রী।

'মাদাম,' মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলাম। 'এভাবে হুট করে এসে আপনাকে অসুবিধার মধ্যে…'

'মোটেও না,' বাধা দিলেন মহিলা। 'আপনি আতিথ্য গ্রহণ করায় আমি খুবই খুশি হয়েছি। আমার ছেলেও আনন্দের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাবে। এই মুহূর্ত থেকে এ-বাড়ি আপনার সেবায় প্রস্তুত, আপনি এটাকে নিজের বাড়ি মনে করলে আমরা বাধিত হব।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। শুধু আজ রাতটুকুর জন্যে আমি আশ্রয়প্রার্থী। কাল ভোরে চলে যাব।'

'আপনার যেমন খুশি, কেউ বাধা দেবে না। তবে বেশ কিছুদিন এখানে থেকে বেড়িয়ে গেলে আমরা সম্মানিত বোধ করব।'

আবারও মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করলাম।

'মাখিয়া,' বললেন মাদাম দো ফ্রানশি, 'মশিয়েকে লুই-র ঘরটা দেখিয়ে দাও। এখনি ফায়ারপ্লেসে আগুন দাও, আর গরম পানি পৌঁছে দাও ওঁর ঘরে। আপনি ওর সঙ্গে যান,' আমার দিকে ফিরলেন আবার। 'যা যা লাগে ওর কাছে চাইবেন। আর একঘণ্টা পর সাপার। আমার ছেলে ফিরে আসবে এর মধ্যেই। খুব খুশি হবে আপনাকে পেয়ে।'

'আমার এই ট্র্যাভেলিং ড্রেস…'

'আমরা কিছুই মনে করব না। আপনিও আমাদের ত্রুটিপূর্ণ গ্রাম্য রীতিনীতি ক্ষমা করে দেবেন।'

আর একবার 'বাউ' করে চাকরানীর পিছু নিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। বেশ বড়সড় একটা ঘর। জানালা দিয়ে বাড়ির পিছনের আঙিনা দেখা যায়। চমৎকার বাগান, থোকা থোকা মার্টল আর অলিয়েনডার ফুলে ছেয়ে আছে; মাঝখান দিয়ে কোনাকুনি ভাবে বইছে ছোট্ট একটা ঝর্না।

ঘরের দেয়াল সাদা হোয়াইটওয়াশ করা। চমৎকার, সুরুচিপূর্ণ ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টিং ঝুলছে দেয়ালে। এক নজরেই বুঝলাম, প্যারিস প্রবাসী ছেলের ঘরটা আমাকে দেয়া হয়েছে। সন্দেহ নেই, এ-বাড়ির সবচেয়ে ভাল ঘর এটা, প্রতিটি আসবাব ঝকঝকে পালিশ করা। আরাম-আয়েশের সবরকম আয়োজন দেখে বোঝা যায় পরিবারটি শুধু সম্ভ্রান্তই নয়, সচ্ছলও। খাট, ডিভান, চেয়ার, টেবিল, আর্মচেয়ার ইত্যাদি ঘুরে আমার দৃষ্টি আটকে গেল নানারকম বইয়ে ঠাসা বুককেসের ওপর। ফ্রান্সের বড় বড় কবি রাসিন, মলিয়ে, লা ফনতাইন, রোসনা, ভিক্তর হুগো, লামাখতাইন-এর কাব্য; মনতাইন, প্যাসক্যাল, লা বুখিয়ের-এর দর্শন; ঐতিহাসিক মেজিখে, শাতোবিখইয়ান্দ, অগস্তিন থিয়েখ-এর গ্রন্থ; বৈজ্ঞানিক কুভিয়ে, বঁদো, ইলি দো বোমঁ—কার বই নেই? এরপর উপন্যাসগুলোর মধ্যে আমার নিজের লেখা 'আম্প্রেসিও দো ভোয়া' দেখে রীতিমত খুশি হয়ে উঠল মনটা।

একটা ড্রয়ার টেনে দেখলাম বেশ কিছু হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি। কর্সিকার

কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে লেখা কয়েকটা পাতা; কিভাবে দীর্ঘ পারিবারিক কলহ ও খুনোখুনি বন্ধ করা যায় তার ওপর একটি রচনা, গোটা কয়েক ফরাসী পদ্য, কিছু ইটালিয়ান সনেট। এসব থেকে মশিয়ে লুই দো ফ্রানশি সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পেয়ে গেলাম।

সুশিক্ষিত, চমৎকার যুবক, সন্দেহ নেই। দেশের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যেই আইন পড়তে গেছে প্যারিসে। স্নান সেরে জামা-কাপড় পরতে পরতে ভাবছিলাম এসব। ভেলভেটের জ্যাকেট গায়ে দিয়ে মাথায় একটা নরম ফেল্টের হ্যাট চাপিয়েছি, এমনি সময়ে এসে দাঁড়াল সেই উর্দি পরা বাটলার; জানাল: মশিয়ে লুসিয়েন দো ফ্রানশি ফিরেছেন। তিনি অনুমতি চাইছেন, আমাকে স্বাগত জানাবার জন্যে আসতে চান।

'নিশ্চয়ই!' জবাব দিলাম। 'মশিয়ে লুসিয়েন দো ফ্রানশি যখন খুশি আসতে পারেন, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।'

খানিক পর পায়ের শব্দ পেলাম, প্রায় ছুটে এসে ঘরে ঢুকল প্রাণবন্ত এক তরুণ।

তিন

বিশ-একুশ বছর বয়সের তরুণ, চোখ ও চুল কালো, গায়ের রঙ রোদে পুড়ে বাদামী, দেখতে চমৎকার, সুন্দর স্বাস্থ্য, তবে খুব একটা লম্বা নয়। রাইডিং ড্রেস পরেই চলে এসেছে দেখা করতে। সবুজ ওয়েইস্টকোট পরা, কোমরে গুলির বেল্ট, ধূসর রঙের ট্রাউজারের এখানে-ওখানে চামড়া বসানো, পায়ে বুট ও স্পার। কার্ট্রিজ বেল্ট থেকে একপাশে ঝুলছে একটা পানির ফ্লাস্ক, অন্যপাশে একটা পিস্তল। এক হাতে একটা ইংলিশ কারবাইন ধরা।

বয়সে তরুণ হলেও আমার আশ্রয়দাতার চেহারায় স্বাবলম্বী ভাব ও প্রবল ব্যক্তিত্বের ছাপ লক্ষ করে বিস্মিত হলাম। বোঝা যাচ্ছে, মানুষটা চৌকস, ভাব-জগৎ নয়, কর্মজগতের লোক; নির্ভয়ে বিপদের মুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখে—হয়তো বিপদকে ভালও বাসে। গম্ভীর যেহেতু সে একা, শান্ত যেহেতু ক্ষমতাবান।

এক নজরেই আমার সবকিছু দেখে নিল যুবক, আমার ট্র্যাভেল কেস, অস্ত্র, জামা-কাপড়—যেগুলো ছেড়েছি, যেগুলো পরেছি—কিছুই চোখ এড়াল না। বুঝলাম, নিমেষে পরিস্থিতি বুঝে নেয়ার এবং মানুষ চিনে নেয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে যুবক, হয়তো যে পারিপার্শ্বিকতায় এর বাস, তাতে অনেক সময় জীবন-মরণ নির্ভর করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার ওপর।

'মাফ করবেন, মশিয়ে, বোধহয় বিরক্ত করছি আপনাকে,' বলল লুসিয়েন। 'তবে বিশ্বাস করুন, আপনার কথা শুনেই অস্থির হয়ে পড়েছি। প্রথমত, আপনার কিছু প্রয়োজন আছে কি না জানার জন্যে। দ্বিতীয়ত, মেইনল্যান্ড থেকে কোনও ফরাসী অতিথি আমাদের বাড়িতে এলে আমরা, আধা-সভ্য কর্সিকানরা, ভয়ে মরে যাই, বুক কাঁপে কোথায় কি ত্রুটি হয়ে যায় তাই ভেবে।'

হাসলাম। 'মশিয়ে, আপনার ভয় অমূলক। সত্যি। একজন ক্লান্ত পর্যটকের প্রয়োজন মাদাম দো ফ্রানশি যতটা বুঝে যা ব্যবস্থা নিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি কিছু করার সাধ্য আর কারও আছে বলে আমি মনে করি না। তাছাড়া,' আবার হাসলাম, 'আধা-সভ্য কর্সিকানের কোনও চিহ্ন কিন্তু এই ঘরের কোথাও খুঁজে পাইনি—জানালার বাইরে তাকিয়ে এদেশের অপূর্ব মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য না দেখলে যে-কেউ বলবে এটা প্যারিসের সবচেয়ে অভিজাত, সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান

এক ব্যক্তির কামরা।'

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল যুবকের চোখ-মুখ। 'এটা আমার ভাই লুই-এর ঘর। ও ফরাসী আচার-আচরণ-শিক্ষা-সভ্যতার অনুসারী। তবে আমার মনে হয় না প্যারিস থেকে ওখানকার রীতিনীতি রপ্ত করে এখানে ফিরে এসে ও মানিয়ে নিতে পারবে।'

'আপনার ভাই কি অনেকদিন আগে গেছেন?'

'দশ মাস, মশিয়ে।'

'ফিরবেন শীঘ্রি?'

'নাহ্, তিন-চার বছরের আগে তো নয়ই।'

'খুবই লম্বা সময়,' মাথা ঝাঁকালাম। 'দু'ভাইয়ের এর আগে তো কখনও ছাড়াছাড়ি হয়নি, তাই না?'

'হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, আমরা পরস্পরের অসম্ভব ভক্তও। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমরা একজন আরেকজনের জন্যে করতে পারি না।'

'লেখাপড়া শেষ হওয়ার আগে ছুটিছাটায় নিশ্চয়ই আসবেন উনি?'

'হয়তো। কথা দিয়েছে, কিন্তু পারবে কি না বলা যায় না।'

'বেশ। কিন্তু আপনি নিজে গিয়ে দেখা করে এলে কে ঠেকাবে?'

'আমি? নাহ্, অসম্ভব—আমি কর্সিকা ছেড়ে কোথাও যাই না, যাবও না।'

কথার সুরে বুঝলাম কর্সিকাকে শুধু ভালবাসে তাই নয়, অন্য দেশের প্রতি একটা বিরূপ মনোভাবও রয়েছে লুসিয়েনের মধ্যে। মৃদু হাসলাম।

'আপনার কাছে ব্যাপারটা বিদঘুটে ঠেকতে পারে,' ও-ও হাসল, 'যে এই গরীব, হতচ্ছাড়া দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না, সে আবার কেমন লোক। কিন্তু আসলেও তাই। আমি এ-মাটির সন্তান, হোম-ওক গাছ বা ওই অলিয়েন্ডারের ঝোপ-ঝাড়ের মত। সাগর থেকে আসা বাতাস আমার চাই, চাই পাহাড়ী কুয়াশা, খরস্রোতা ঝর্না-নদী, বেয়ে ওঠার জন্যে দুর্গম পর্বত, শিকারের জন্যে গভীর, ঘন জঙ্গল। খোলামেলা জায়গা আর স্বাধীনতা চাই। আমাকে কোনও শহরে নিয়ে গেলে মরে যাব দম আটকে।'

সত্যিই অবাক লাগল। বললাম, 'দু'ভাইয়ের মধ্যে এতই তফাৎ!'

'ওকে চিনলে বলতেন, চেহারায় এমন আশ্চর্য মিল থাকা সত্ত্বেও!'

'খুব মিল বুঝি?'

মাথা ঝাঁকাল লুসিয়েন। 'এতই বেশি যে ছোট বেলায় আমাদের কোন্‌জন কে তা চেনার জন্যে কাপড়ে চিহ্ন দিয়ে রাখতেন মা।'

'তারপর যখন বড় হয়ে উঠলেন?'

'দু'জন দুই রকম জীবন যাপন করি, তাই বড় হয়ে গায়ের রঙে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে, তাছাড়া আর সব হুবহু এক। সব সময় ঘরের মধ্যে বই বা ছবির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থেকে আমার ভাই কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, আর আমি মাঠে-ময়দানে পাহাড়ে-পর্বতে টো-টো করে হয়ে গেলাম কিছুটা বাদামী।'

'মিলটা নিজ চোখে দেখার সুযোগ পেলে খুশি হব,' বললাম। 'আপনি মশিয়ে লুই দো ফ্রানশিকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে আমার হাতে কোনও মেসেজ দিলে দেখা হয়ে যাবে ওঁর সঙ্গে।'

'নিশ্চয়ই, আনন্দের সঙ্গে দেব, আপনি যদি দয়া করে নিয়ে যান। কিন্তু, মাফ করবেন, আপনি দেখছি সাপারের জন্যে প্রায় তৈরি হয়ে গেছেন, আমি পিছনে পড়ে গেছি। পনেরো মিনিটের মধ্যে সাপারে বসতে হবে।'

'আমার জন্যে কাপড় পাল্টানোর কষ্ট করবেন না, প্লীজ।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু এগুলো ছেড়ে আমাকে পাহাড়ের উপযোগী কাপড় পরতেই

হবে। সাপারের পর যেদিকে যাব, এই বুট আর স্পার পরে সেদিকে যাওয়া যায় না।'

'খেয়েদেয়ে বেরোচ্ছেন কোথাও?'

'হ্যাঁ, একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকালাম।

'না-না! যা ভাবছেন তা নয়; কাজের অ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

'বেশ তো! আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করে নিজেকে...'

'কী যে বলেন,' সরল হাসি লুসিয়েনের মুখে। 'আমার ব্যক্তিগত বা গোপন কোন কথা নেই। কখনও কোন প্রেমিকা ছিল না আমার, থাকবেও না। আমার ভাই যদি বিয়ে করে আর তাদের ছেলেমেয়ে হয়, এমনও হতে পারে আমি আর বিয়েই করব না। আর ও যদি বউ না পায় তাহলে আমাকে একটা খুঁজে নিতে হবে, যাতে বংশের ধারাটা নষ্ট না হয়। আপনাকে তো বলেইছি, আমি বুনো টাইপের লোক, এক শতাব্দী দেরি করে জন্মেছি। কিন্তু এরকম বকবক করতে থাকলে সাপারের জন্যে সময় মত তৈরি হতে পারব না।'

'আপনার সঙ্গে গল্প করতে ভাল লাগছে,' বললাম। 'এক কাজ করুন না। ওপাশের ঘরটাই তো আপনার, দরজাটা খোলা রাখুন যাতে কথা চালিয়ে যেতে পারি।'

'তারচেয়ে আমার ঘরেই চলে আসুন। আমি ড্রেসিংরুমে কাপড় পাল্টাতে পারব কথা বলতে বলতে। অস্ত্রশস্ত্র আপনার ভাল লাগে আশা করি, তাই যদি হয়, আমারগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে পারবেন। ওগুলোর কয়েকটার আবার ঐতিহাসিক মূল্য আছে।'

চার

ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালাম। দু'ভাই দেখছি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির! মনে হচ্ছে যেন কোন অস্ত্রাগারে এসে ঢুকেছি।

পুরানো আমলের আসবাবপত্র। সবচেয়ে আধুনিক যেটা, সেটা তৈরি হয়েছে পঞ্চদশ কি ষোড়শ শতাব্দীতে। খাট, চেয়ার, টেবিল যদিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বয়সে অনেক প্রাচীন। স্প্যানিশ লেদারে দেয়াল ঢাকা। যেখানে কিছুটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেছে, সেখানেই কোন না কোন প্রাচীন বা আধুনিক মারণাস্ত্র। যেন কোনও যোদ্ধার ঘর।

'তিনটে শতাব্দীকে পাবেন আপনি এ ঘরে,' বলল লুসিয়েন। 'দেখুন ঘুরে-ফিরে, আমি চট্ করে কাপড়টা বদলেই চলে আসছি।'

'এসব পিস্তল, বন্দুক, ছোরা, তলোয়ারের কোন্‌টা না কি বলছিলেন ঐতিহাসিক...'

'হ্যাঁ। তিনটে। এক-এক করে দেখুন। প্রথমে খাটের মাথার কাছে দেখুন একটা ড্যাগার, হ্যান্ডেলটা বড়, শেষমাথায় একটা সীল আছে।'

'পেয়েছি।'

'ওটা সাম্পিয়েতখোর ড্যাগার।'

'অ্যাঁ! বলেন কি! সেই কুখ্যাত সাম্পিয়েতখো, ভ্যানিনার খুনী!'

'খুনী? না, ওটা ছিল প্রতিশোধ।'

'একই কথা। অন্তত আমার কাছে।'

'পৃথিবীর অন্য কোথাও হয়তো এক, কর্সিকায় নয়।'

'খাঁটি জিনিস? মানে, ড্যাগারটা সত্যিই...'

'দেখুন না, সাম্পিয়েতখোর কোর্ট অভ আর্মস আঁকা রয়েছে। লক্ষ করুন, ফ্রান্সের লিলি কিন্তু নেই। তখন পর্যন্ত 'ফ্লোর দ্য লী' (লিলির চিহ্ন) ব্যবহার করবার অনুমতি পায়নি সাম্পিয়েতখো। পাখপিগনা দখলের পর অনুমতি মেলে।'

'ও, এটা আমার জানা ছিল না। তা, এই ড্যাগার আপনার কাছে এলো কি করে?'

'তিনশো বছর ধরে রয়েছে এটা আমাদের পরিবারে। স্যাম্পিয়েতখো নিজেই দিয়েছিল এটা আমাদের এক পূর্বপুরুষ নাপোলিওঁ দো ফ্রানশিকে।'

'ঘটনাটা জানা আছে আপনার?'

'আছে। সাম্পিয়েতখো আর আমার সেই পূর্বপুরুষ একবার একটা অ্যামবুশে পড়ে মরণপণ লড়াই করতে বাধ্য হয়েছিল। যুদ্ধে সাম্পিয়েতখোর শিরস্ত্রাণ খুলে পড়ে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময় শত্রুদের একজন বিশাল এক মুগুর তুলেছিল ওর মাথাটা গুঁড়িয়ে দেবে বলে। তাই দেখে আমার পূর্বপুরুষ, সেই নাপোলিওঁ, তার ছোরাটা আমূল গেঁথে দিয়েছিল লোকটার শরীরে বর্মের ফাঁক দিয়ে। আহত শত্রু আঁতকে উঠে ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে তীরবেগে পালিয়ে গেল জান-প্রাণ নিয়ে, ছোরাটা আর উদ্ধার করা গেল না। যা মনে হয়, প্রিয় ছোরাটা হারিয়ে আমার পূর্বপুরুষ এতই হা-হুতাশ করেছিল যে সাম্পিয়েতখো নিজেরটা দান করেছিল তাকে। এত চমৎকার একটা ড্যাগার পেয়ে নিজের ছোরার দুঃখ ভুলেছিল নাপোলিওঁ। ছোরাটা স্পেনে তৈরি, দুটো পাঁচ ফ্রাঁ মুদ্রা একটার ওপর আরেকটা রেখে কোপ দিন, দেখবেন চার টুকরো হয়ে গেছে ওগুলো।'

'সত্যিই দেখব?'

'দেখুন না।'

মেঝেতে দুটো পাঁচ ফ্রাঁ মুদ্রা রেখে ধাঁই করে মারলাম। মিথ্যে বলেনি লুসিয়েন, চারটুকরো হয়ে গেছে মুদ্রা দুটো।

'হুঁ,' বললাম, 'কোনও সন্দেহ নেই এটা সাম্পিয়েতখোর ড্যাগার। ভাবছি, এত চমৎকার একটা অস্ত্র থাকতে বউটাকে খুন করল গলায় দড়ি পেঁচিয়ে!'

'তখন ওর কাছে ছিল না এটা,' বলল লুসিয়েন, 'দিয়ে দিয়েছিল নাপোলিওঁকে।'

'তা ঠিক।'

'ষাটেরও ওপরে তখন সাম্পিয়েতখোর বয়স; কনস্টান্টিনোপল থেকে এক্স-এ ছুটে এসেছিল। মেয়েমানুষের যে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে নাক গলানো উচিত নয়, সেই শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে ও দুনিয়াকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ড্যাগারটা রেখে দিলাম।

'এই যে হুকে ঝুলিয়ে দিলাম সাম্পিয়েতখোর ড্যাগার। এর পরেরটা ধরা যাক এবার।'

কাপড় পরতে পরতেই বলল লুসিয়েন, 'পাশাপাশি দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছেন দেয়ালে?'

'হ্যাঁ, পাওল আর নাপোলিওঁ।'

'ঠিক। পাওলের ছবির পাশে একটা তলোয়ার দেখা যায়?'

'হ্যাঁ।'

'এটা ওঁর।'

'পাওলের তলোয়ার? ওই ড্যাগারের মতই খাঁটি?'

'ঠিক। এটাও দান, তবে কোনও পূর্বপুরুষকে নয়, তার মা-কে।'

'মা-কে!'

'হ্যাঁ। আপনি হয়তো শুনেছেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এক যুবককে নিয়ে একজন মহিলা এসে হাজির হয়েছিলেন সুলাকাখো টাওয়ারে?'

'না তো, শুনিনি। বলুন না।'

'ছোট গল্প। সুলাকাখো টাওয়ারে এসে পাওলের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন সেই মহিলা। পাওল তখন খুব ব্যস্ত, এই অজুহাতে তাঁকে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল প্রহরীরা। কিন্তু মহিলা নাছোড়বান্দা। তিনি ঢুকবেনই, প্রহরীরাও ঢুকতে দেবে না। হট্টগোল শুনে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে পাওল জানতে চাইলেন ব্যাপার কি, গোলমাল কিসের।

' "আমি," বললেন মহিলা, "আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

' "বেশ তো, বলুন কি বলবেন।"

' "দুই ছেলে আমার," বললেন মহিলা, "গত কাল জানতে পারলাম বড়টি মাতৃভূমি রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছে যুদ্ধে। তাই ষাট মাইল হেঁটে ছোটটাকে নিয়ে এসেছি, আপনার হাতে তুলে দেব বলে।" '

'দারুণ তো! দারুণ কাহিনী! কে এই মহিলা?'

'আমার পিতামহী। কথাটা শোনা মাত্র কোমর থেকে তলোয়ার খুলে উপহার দিয়েছিলেন তাঁকে পাওল।'

'চমৎকার! সম্মান দেখানোর চমৎকার ভঙ্গি!'

'এ-সম্মানের উপযুক্ত ছিলেন তিনি··· আপনার কি মনে হয়?'

'নিশ্চয়ই। সত্যিকার বীরাঙ্গনা।' একটা খড়্গের ওপর চোখ পড়ল আমার, 'আর এই খড়্গটা?'

'ওইটা? ব্যাট্‌ল্ অভ পিরামিডে বোনাপার্তের কোমরে ছিল ওটা।'

'কিভাবে এল এখানে?'

'আমার ঠাকুর্দা ছিলেন বোনাপার্তের সৈন্যদলে। যুদ্ধের পর তিনি আমার দাদাকে হুকুম দেন জনা পঞ্চাশেক সৈন্য নিয়ে মামলুকদের একজন আহত চীফকে ধরে আনার জন্যে। সিংহের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে মামলুকদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে চীফকে ধরে আনলেন তিনি ফার্স্ট কনসালের কাছে। কিন্তু ওঁর "সেবার" (খড়্গ) তো আর খাপে ঢোকে না। মামলুকদের দামাস্কান অস্ত্রের সঙ্গে ঠোকাঠুকিতে ওটা এতই বেঁকেচুরে গেছে যে কিছুতেই ঢোকানো গেল না খাপে। শেষে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ওটা। তাই দেখে বোনাপার্ত নিজের খড়্গটা তাঁকে দিয়ে দেন।'

'কিন্তু আমি হলে কমান্ডার-ইন-চীফের ভাল সেবারের চেয়ে আমার ঠাকুর্দার তেড়াব্যাঁকা সেবারটাই ঝুলিয়ে রাখতাম আমার ঘরের দেয়ালে।'

'উল্টোদিকের দেয়ালটা দেখুন, ওটাকেও দেখতে পাবেন। ফার্স্ট কনসাল ওটাকে তুলে নিয়ে বাঁটের গায়ে একটা হীরের টুকরো বসিয়ে ফেরত পাঠিয়েছিলেন আমাদের কাছে। ফলার গায়ের লেখাটা পড়ে দেখতে পারেন।'

দুই জানালার মাঝের দেয়ালে সত্যিই একটা বাঁকাচোরা 'সেবার' দেখতে পেলাম, খাপে ঢোকানো আছে যতটুকু যায়। কাছে গিয়ে ফলার গায়ে খোদাই করা লেখাটা পড়লাম:

ব্যাট্‌ল অভ্ দ্য পিরামিড্‌স্, ২১ জুলাই, ১৭৭৮।

এই সময় বাটলার এসে ঢুকল ঘরে। লুসিয়েনকে বলল, 'ইয়োর এক্সেলেন্সি, খাবার দেয়া হয়েছে, একথা আপনাকে জানাতে বললেন মাদাম দো ফ্রানশি।'

'ভেরি গুড, গ্রিফো,' বলল লুসিয়েন, 'মাকে বলো, এক্ষুণি নামছি আমরা।'

পাহাড়ী পোশাক পরে ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে এল লুসিয়েন। বেরিয়েই দেখল, আমি খুব মনোযোগ দিয়ে দুটো রাইফেল পরীক্ষা করছি। দুটোরই গায়ে খোদাই

করা রয়েছে:

২১ সেপ্টেম্বর, ১৮১৯—সকাল এগারোটা।

'ওগুলোরও ইতিহাস আছে,' বলল লুসিয়েন। 'আমাদের পারিবারিক ইতিহাস। ওগুলোর একটা আমার বাবার।'

'আচ্ছা! আর অন্যটা?'

হাসল লুসিয়েন। 'আর অন্যটা আমার মায়ের। এখন চলুন, নামি; ওরা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।'

পাঁচ

লুসিয়েনের শেষ কথাটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। আর অন্যটা আমার মায়ের! মাদাম দো ফ্রানশিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছি এখন। ছেলে খাবার-ঘরে ঢুকেই ভক্তিভরে চুমো খেল তাঁর হাতে, রানীর মহিমা নিয়ে তিনি এ-আনুগত্য গ্রহণ করলেন। ইঙ্গিতে চেয়ার দেখিয়ে আমাদের বসতে বললেন, বসলাম।

'কিছু মনে কোরো না, মা, তোমাকে বোধহয় বসিয়ে রেখেছি অনেকক্ষণ।'

'দোষটা অবশ্য আমার,' মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানিয়ে বললাম, 'মশিয়ে লুসিয়েন আমাকে কয়েকটা আশ্চর্য চমৎকার জিনিস দেখিয়েছেন, আমি ওগুলোর অতীত ইতিহাস জানতে চেয়ে ওঁকে দেরি করিয়ে দিয়েছি।'

'কিচ্ছু ভাববেন না,' মৃদুহেসে এক হাত তুলে আমাকে আশ্বস্ত করলেন মাদাম। 'আমি এইমাত্র এসে বসলাম। তবে…' ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, 'লুইয়ের খবর জানার জন্যে অস্থির হয়ে আছি।'

'আপনার ছেলে কি অসুস্থ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'লুসিয়েনের তাই ধারণা,' বললেন তিনি।

'চিঠি এসেছে?' লুসিয়েনের দিকে ফিরলাম আমি।

'না, কোন খবরও না,' মাথা নাড়ল লুসিয়েন, 'সেইজন্যেই ওর জন্যে আরও দুশ্চিন্তা হচ্ছে।'

একটু অবাক হলাম। চিঠি আসেনি, খবরও আসেনি; তাহলে কি করে জানছে এরা যে লুই অসুস্থ? যেন আমার এই নীরব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, এমনি ভাবে লুসিয়েন বলল, 'জানতে পারলাম এই জন্যে যে, গত কয়েকটা দিন আমার নিজেরও শরীরটা ভাল ঠেকছে না।'

'কিন্তু… কিছু মনে করবেন না, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না…'

'আপনি জানেন না যে আমরা যমজ?'

'জানি। গাইড বলেছে।'

'জন্মের সময় আমাদের একটা পাশ জোড়া ছিল, একথা বলেনি?'

'না। তা বলেনি।'

'আসলে ডাক্তারকে ছুরি চালিয়ে আমাদের আলাদা করতে হয়েছিল। ফলে যেখানে যত দূরেই থাকি না কেন, একই শরীর আমাদের—আমরা একে অপরের শারীরিক বা মানসিক অবস্থা টের পাই। গত কয়েকটা দিন কোনও কারণ ছাড়াই খারাপ লাগছে আমার; কেমন যেন হতাশা, বিষাদ আর পরাজিত ভাব। কেউ যেন সাঁড়াশী দিয়ে চেপে ধরেছে হৃৎপিণ্ডটা। স্পষ্ট বুঝতে পারছি প্রচণ্ড কোনও কষ্টের মধ্যে আছে আমার ভাই।'

অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। বলে কি! আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, মাদাম দো ফ্রানশি ওর প্রতিটা কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করছেন, যেন এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। ম্লান, বিষণ্ণ হাসি তাঁর মুখে। বললেন, 'দূরের জন খোদার হাতে, তিনিই তার সহায়। সবচেয়ে বড় কথা, তুমি বুঝতে পারছ ও বেঁচে আছে।'

'ও যদি মারা যেত,' শান্ত, নিচুগলায় বলল লুসিয়েন, 'তাহলে তো ওকে দেখতেই পেতাম।'

'যদি কিছু দেখো, আমাকে জানাবে তো? লুকাবে না?'

'না, মা। সঙ্গে সঙ্গে জানাব। তুমি তো জানোই, তোমার সঙ্গে কোনদিন আমি কোনরকম ছল-চাতুরী করিনি, করবও না।'

'হ্যাঁ, সেটা আমি জানি,' বললেন মা, চোখ দুটো স্নেহের ধারা বর্ষণ করল পুত্রের ওপর, তারপর ফিরলেন আমার দিকে, 'মাফ করবেন, মশিয়ে। মায়ের উদ্বেগ লুকাতে পারিনি। ওরা দুজন শুধু আমার ছেলে নয়, এ-বংশের শেষ ছেলে। আসুন, শুরু করা যাক।'

লম্বা টেবিলের এক মাথায় আমরা তিনজন, অন্য মাথায় বসেছে পরিবারের ছয়জন দূর সম্পর্কের আত্মীয়—কর্সিকার ধনী পরিবারে এরা চাকর ও মনিবের মাঝামাঝি অবস্থানে থেকে মনিবদের মত প্রায় সবরকম সুযোগ-সুবিধেই ভোগ করে।

নানারকম লোভনীয় খাবার সাজানো রয়েছে টেবিলে, পেটে খিদেও আছে, কিন্তু তেমন কিছু খেতে পারছি না। কারণ, নানান চিন্তা ঢুকে পড়েছে মাথার ভেতর। যেন স্বপ্নের ঘোরে রয়েছি, আশেপাশে যা ঘটছে সে-সব যেন সত্য নয়। এই মহিলা কেমন মহিলা, যিনি যোদ্ধা পুরুষের মত রাইফেল চালিয়ে থাকেন? ছেলেটাই বা কেমন, যে নয়শো মাইল দূর থেকেও ভাইয়ের কষ্ট টের পায়? কেমন মা ইনি, ছেলের কাছ থেকে কথা আদায় করেন যেন ভাইয়ের মৃত্যুর খবর সঙ্গে সঙ্গে জানায় তাঁকে?

খানিক বাদেই বুঝলাম, অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে, কথা বন্ধ করে অমনোযোগী হয়ে পড়া ঠিক হয়নি; মাথা তুলে তাকালাম। মা ও ছেলে দুজনেই টের পেলেন কথাবার্তা চালিয়ে যেতে চাই।

'কিন্তু,' যেন এতক্ষণ কথোপকথন চলছিল, এমন ভঙ্গিতে জানতে চাইল লুসিয়েন, 'বেড়াবার জন্যে কর্সিকাকে বাছাই করলেন কেন?'

'অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল, হঠাৎ করে ছুটি পাওয়ায় সুযোগ হয়ে গেল।'

'আর বেশি দেরি না করে বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। ফরাসী রীতিনীতি, রুচি-পছন্দ যে-রকম দ্রুত অনুপ্রবেশ করছে, আর কয়েক বছর পর কর্সিকাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'তবে আমার ধারণা, আপনাদের প্রাচীন ঐতিহ্য আর জাতীয় চেতনা যদি আধুনিক সভ্যতাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে দ্বীপের কোনও একটা এলাকায় অবস্থান নেয়—সেটা হবে তাভাখো উপত্যকার এই সাখতান প্রদেশ।'

'আপনার তাই মনে হয়?' হাসিমুখে বলল যুবক।

'হ্যাঁ। এখানেই আমি প্রাচীন কর্সিকার রীতিনীতি ও মহান ঐতিহ্যের জলজ্যান্ত নমুনা দেখতে পাচ্ছি।'

'তা ঠিক। তবে আমার মা আছেন, আমি আছি, আমাদের চারশো বছরের ট্র্যাডিশন, ব্যাটলমেন্ট সহ প্রাচীন এই বাড়ি—এই সবকিছুর মাঝখান থেকেও তো আমার ভাইটিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ফরাসী সভ্যতা। প্যারিস থেকে ফিরবে ও একজন পাস করা আইনজ্ঞ হয়ে। বাপের ভিটে ছেড়ে আজাসিওতে প্র্যাকটিস করবে, মেধা দেখাতে পারলে পাবলিক প্রসিকিউটার হবে, জজ হবে, হত্যাকারীকে

আপনার মত বিচার করবে খুনী হিসেবে, বহুপুরুষ থেকে চলে আসা রক্তক্ষয়ী পারিবারিক কলহ থামাবার জন্যে আইন জারি করবে, মৃত্যুদণ্ড দিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে মনে করবে দেশের উপকার করেছে, সভ্যতার নির্মাণে আরেকটা ইঁট গাঁথতে পেরেছে। খোদা! হায়, খোদা!'

'যাই হোক, এটুকু তো মানবেন, ভারসাম্য ঠিকই রেখেছেন খোদা—তাকে যেমন নতুন মত ও পথের অনুসারী করেছেন, তেমনি পুরানো ঐতিহ্য ও ধ্যান-ধারণা রক্ষার ভার দিয়েছেন আপনার ওপর।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল লুসিয়েন, 'আমি পারছি না। একজন ফ্রানশি হিসেবে আমার যা করা উচিত ছিল তার বিপরীত কাজ করতে হচ্ছে আমাকে।'

'তাই বুঝি?'

'জ্বী। সাখতানে আসলে আপনি কি দেখতে এসেছেন বলব?'

'বলুন।'

'ব্যবসায়ী, শিল্পী, বা কবি—আপনি যা-ই হন না কেন, এসেছেন কৌতূহল মেটাতে। আমি জানি না আপনি কী, প্রশ্নও করতে চাই না, ইচ্ছে হলে চলে যাবার আগে বলবেন, ইচ্ছে না হলে বলবেন না···আসলে আপনি এসেছেন রক্তক্ষয়ী "ভঁদত" দেখতে, কলহ দেখতে, সত্যিকার দস্যু দেখতে—বইপত্রে যেমন দেখা যায়।'

'অস্বীকার করছি না,' বললাম। 'এ গ্রামে এসে কিছুটা দেখতেও পেয়েছি। একমাত্র এই বাড়িতেই কোনও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নেই।'

'ঠিক এই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। আমার বাপ-দাদার রীতিনীতি আমি ভঙ্গ করেছি। ভঁদত চলছে এ গ্রামে দশ বছর ধরে, আমার পূর্বপুরুষরা এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে যে-কোন একটা পক্ষ নিতেনই, জড়িয়ে পড়তেন পিস্তল-বন্দুক-ছোরা নিয়ে। আর আমি···আমি কি ভূমিকা পালন করছি জানেন? আমি আম্পায়ার!' মাথা নাড়ল লুসিয়েন। 'দস্যু দেখতে চান? তাহলে চলুন আমার সঙ্গে, সত্যিকার দস্যু দেখিয়ে আনি আপনাকে।'

'সত্যিই? আমাকে সঙ্গে নেবেন আপনি?'

'কেন নয়? আপনি আগ্রহী হলে কেন নেব না?'

'বেশ তো, আমি রাজি—আনন্দের সঙ্গে।'

'মশিয়ে ক্লান্ত হয়ে আছেন,' বললেন মাদাম দো ফ্রানশি। তারপর এমন দৃষ্টিতে তাকালেন ছেলের দিকে, স্পষ্ট বুঝলাম, লুসিয়েনের বক্তব্যের সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ একমত।

'না, মা। তুমি বাধা দিয়ো না, আসুন উনি, দেখে যান। প্যারিসে ফিরে যখন মানুষকে গল্প করতে শুনবেন: কী ভয়ঙ্কর আমাদের ভঁদত (Vendetta), কী নিষ্ঠুর কোখসিয়াঁ দস্যু; তখন আমাদের হয়ে হয়তো দু'চারটে সত্য কথা উনি বলতে পারবেন।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে একটা কলহ মিটমাট হওয়ার পথে। আসলে কী নিয়ে চলছিল ঝগড়া?'

'আমাদের এখানে ঝগড়ার কারণ মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়, ফলাফলটাই হচ্ছে গুরুত্বের,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল লুসিয়েন।

বুঝলাম, দশ বছর ধরে যে রক্তক্ষয়ী কলহে অংশ নিল সুলাকাখো গ্রামের অধিবাসীরা; কারণটা তার তুচ্ছ কিছুই হবে—বাইরের একজনকে বলতে দ্বিধা করছে লুসিয়েন, পাছে হাসির খোরাক হয়। আমারও জেদ চেপে গেল।

'যাই হোক,' বললাম আমি। 'ঝগড়ার কারণ তো নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে। ওটা কি গোপনীয় কিছু?'

'আরে, না। অখলান্দ আর কলোনা পরিবারে এর সূত্রপাত।'

'কিভাবে?'

'শুনবেন? যখন অখলান্দের উঠান থেকে একটা মোরগ উড়ে গিয়ে পড়েছিল কলোনার উঠানে। অখলান্দের বাড়ি থেকে মোরগটা ধরে আনতে গেলে কলোনারা বলে ওটা ওদের। অখলান্দরা বলে বিচার বসাবে। শুনে যে বুড়ি মোরগটা ধরেছিল সে ঘাড় মুচড়ে ওটাকে মেরে ছুঁড়ে দিয়েছিল প্রতিবেশীর মুখে, "ঠিক আছে, তোমাদের মোরগ হলে খাও গে যাও।" তখন অখলান্দদের একজন মরা মোরগটা ঠ্যাং ধরে তুলে বুড়িকে ওটা দিয়ে পিটাতে গেল। মারার জন্যে হাত তুলেছে, এমনি সময় কলোনাদের একজন, হাতের রাইফেলটা তুলে—ও জানত না গুলি ভরা আছে রাইফেলে—টিপে দিল ট্রিগার। মারা গেল একজন। এই হলো শুরু।'

'তারপর এ-পর্যন্ত কতজন মারা পড়েছে?'

'মোট নয়জন।'

'ওই একটা মোরগের জন্যে?'

'হ্যাঁ। একটু আগেই বলেছি, কারণটা মুখ্য নয়, ধরতে হবে ফলাফলটা।'

'আর নয়জন যখন মরেইছে, দশজন হলে কতটাই বা এসে যাবে!'

'না। তা নয়,' বলল লুসিয়েন। 'আর মরবে না, আমি যখন আম্পায়ার হয়েছি।'

'কার অনুরোধে? অখলান্দ না কলোনা?'

'না-না, এদের কেউ না। আমার ভাইয়ের অনুরোধে। চ্যান্সেলর ধরেছেন আমার ভাইকে, আর সে-ও রাজি হয়েছে। আরে, বাবা, কর্সিকার এক ছোট্ট গ্রামে কি হচ্ছে তা নিয়ে তোমাদের এত মাথা ব্যথা কেন? প্রিফেক্ট ব্যাটা চ্যান্সেলরকে লিখেছে আমি যদি একটা তুড়ি বাজাই, তাহলেই ভোজবাজির মত থেমে যাবে লড়াই। ব্যস, ধরে বসেছে আমার ভাইকে, আর ভাইও কথা দিয়েছে যে আমাকে রাজি করানোর ভার তার। এই হচ্ছে ব্যাপার,' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল লুসিয়েন। 'আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না, ফ্রানশিদের কেউ তার ভাইয়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে।'

'তার মানে একটা নিষ্পত্তি করে ফেলেছেন?'

'উপায় ছিল না।'

'অর্থাৎ, আমরা আজ সন্ধ্যায় এক পার্টির চীফের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি?'

'ঠিক। গত রাতে অপরজনের সঙ্গে দেখা করেছি।'

'কোথায় দেখা হবে? অনেক দূর?'

'শাতো দি ভিসেন্তেইলো দিস্ত্রির ধ্বংসাবশেষে।'

'তাই নাকি? আমি শুনেছি কাছে পিঠেই আছে সেই বিখ্যাত ধ্বংসস্তূপ।'

'মাইল তিনেক হবে।'

'তাহলে পৌনে একঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব আমরা ওখানে।'

'বড়জোর পৌনে একঘণ্টা।'

'লুসিয়েন,' বললেন মাদাম দো ফ্রানশি, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, তোমার মত পাহাড়ী একজনের জন্যে পৌনে একঘণ্টার রাস্তা, কিন্তু মশিয়ে তোমার মত চলতে পারবেন না।'

'ঠিক বলেছ, মা। তাহলে ঘণ্টা দেড়েক, কমপক্ষে।'

'তাহলে হাতে আর সময় নেই।' ঘড়ির দিকে তাকালেন মাদাম দো ফ্রানশি।

'মা,' বলল লুসিয়েন, 'তাহলে বেরিয়ে পড়ি আমরা?'

মায়ের বাড়িয়ে ধরা হাতের পিঠে সসম্মানে চুমো খেয়ে আমার দিকে ফিরল লুসিয়েন, 'না কি ধীরে সুস্থে শান্তি মত সাপার শেষ করে নিজের ঘরে গিয়ে সিগার

টানতে টানতে পা দুটো আগুনের ধারে গরম…'

'না, না! কিছুতেই না!' বললাম আমি। 'দস্যু দেখাবেন বলে কথা দিয়েছেন, দস্যু আমার চাই।'

'বেশ, রাইফেল নিয়েই তাহলে রওনা হয়ে যাব আমরা।'

মাদাম দো ফ্রানশিকে 'বাউ' করে সম্মান দেখিয়ে আমরা যার যার ঘরে গিয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। আমি একটা ট্র্যাভেলিং চেস্ট পরে নিলাম—একধারে ঝুলছে একটা হান্টিং নাইফ, অপর ধারে বারুদ আর গুলি রাখার ব্যবস্থা। লুসিয়েন ওর কার্ট্রিজ ব্যাগ নিল, আর নিল একটা ডাবল-ব্যারেল ম্যান্টন। সুন্দর এমব্রয়ডারি করা একটা টুপিও চড়াল মাথায়।

'আমি কি সঙ্গে আসব, ইয়োর এক্সেলেন্সি?' জানতে চাইল গ্রিফো।

'না, তোমার আসতে হবে না,' বলল লুসিয়েন, 'তবে দিয়ামানকে ছেড়ে দাও, চাঁদের আলোয় যদি এক-আধটা ফেয়্যান্ট মারার সুযোগ পাই, কুড়িয়ে আনতে পারবে।'

একটু পরেই বিশাল একটা স্প্যানিয়েল বেরিয়ে এল বাড়ির বাইরে, আমাদের পায়ে পায়ে চলছে আর মুক্তির আনন্দে লাফাচ্ছে, হাঁক ছাড়ছে।

কয়েক কদম এগিয়েই পিছন ফিরে বলল লুসিয়েন, 'গ্রামের সবাইকে জানিয়ে দিয়ো, পাহাড়ের দিক থেকে যদি গুলির আওয়াজ পায়, যেন মনে করে আমরা।'

'ঠিক আছে, আমি জানিয়ে দিচ্ছি, ইয়োর এক্সেলেন্সি।'

'জানিয়ে রাখছি, যাতে ওরা আবার মনে না করে যুদ্ধ বেধে গেছে।'

কয়েক গজ এগিয়েই ডান দিকের সরু একটা পথ ধরে সোজা চললাম আমরা পাহাড়ের দিকে।

ছয়

চমৎকার তাজা হাওয়া আসছে সাগর থেকে। মন্ত দো কাগনার পিছন থেকে অপূর্ব সুন্দর চাঁদ উঠেছে পরিষ্কার আকাশে। ভূমধ্যসাগরকে মনে হচ্ছে যেন দিগন্ত জোড়া চকচকে এক স্টীলের আয়না। পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠে চলেছি আমরা। আশপাশের অন্ধকার থেকে নানারকম অচেনা শব্দ আসছে কানে।

এক জায়গায় এসে ভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে পথটা। থামল লুসিয়েন। একটা পথ খাড়া উঠে গেছে ওপরে, অন্যটা গেছে পাহাড়ের গা ঘুরে।

'আপনার পায়ের জোর কি রকম?' জানতে চাইল লুসিয়েন। 'পাহাড়ীদের মত শক্তিশালী পা, নাকি…'

'পা দুটো ঠিকই আছে,' জবাব দিলাম, 'গোলমাল মাথায়।'

'অর্থাৎ, নিচে তাকালে মাথা ঘোরে?'

'হ্যাঁ, মনে হয় টানছে আমাকে।'

'তাহলে এই পথে যাই। ওদিক দিয়ে ঘুরে গেলে অনেকগুলো খাদের একেবারে কিনার ঘেঁষে যেতে হবে। এটায় আরাম নেই, বেশ কষ্টই হবে উঠতে; কিন্তু আবার পৌনে একঘণ্টা সময় বেঁচে যাবে।'

'চলুন, এ-পথ ধরেই যাই তাহলে।'

পথ দেখাল লুসিয়েন, হোলি ঝোপের মাঝখান দিয়ে এগোলাম। দিয়ামান আমাদের থেকে পঞ্চাশ-ষাট গজ সামনে রয়েছে; একবার বামের জঙ্গলে ঢোকে, আবার ডানের; খানিক পরপরই রাস্তায় ফিরে এসে লেজ নাড়ে—অর্থাৎ কোথাও

কোনও বিপদ-আপদ নেই, আমার ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারো, চলে এসো, কুইক। বোঝা গেল, ভাল ট্রেনিং পেয়েছে দিয়ামান, দ্বিপদ বা চতুষ্পদ, অর্থাৎ দস্যু বা বুনোশুয়োর—দুরকম জন্তুই শিকার করতে শিখেছে। লুসিয়েনকে বললাম সে-কথা। কিন্তু মাথা নাড়ল ও।

'ভুল হলো। এটা ঠিক, দুরকম জন্তুই তাড়া করতে শিখেছে ও। কিন্তু দস্যুকে নয়। দুপেয়েদের মধ্যে ওর প্রিয় শিকার হচ্ছে টহলদার সৈন্য, মাউন্টেড পুলিশ আর ভলান্টিয়ার।'

'দস্যুদের নয় কেন?'

'কারণ ও একজন দস্যুর কুকুর ছিল। অখলান্দদের একজনের। মাঝে মাঝেই আমি রুটি, বারুদ, বুলেট ইত্যাদি প্রয়োজনীয় নানান জিনিস পাঠাতাম ওর কাছে। একজন কলোনার হাতে মারা পড়ে লোকটা। যাবার জায়গা ছিল না—অনেকদিনের পরিচয়ে একটা বন্ধুত্ব মত গড়ে উঠেছিল আমার সঙ্গে, তাই পরদিন আমার কাছে চলে এল কুকুরটা।'

'আপনার ভাইয়ের ঘরের জানালা দিয়ে আমি অন্য একটা কুকুর দেখেছি মনে হয়।'

'হ্যাঁ, ও হচ্ছে ব্রুসকো; একই ভাবে এসেছে আমার কাছে। তবে একজন অখলান্দের হাতে মারা পড়েছিল ওর প্রভু—এক কলোনা। এখন আমি যদি কোনও কলোনার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম, তাহলে ব্রুসকো থাকত সঙ্গে। ব্রুসকো আর দিয়ামান একই সঙ্গে ছাড়া পেলে কিন্তু খুনোখুনি কাণ্ড ঘটে যাবে।' তিক্ত হাসি হাসল লুসিয়েন। 'দেখুন, মানুষের সঙ্গে কত তফাৎ। মানুষ আপোস করবে, চুক্তি স্বাক্ষর করবে, হয়তো এক টেবিলে বসে খাবেও—কিন্তু ওদের কুকুররা কোনদিন একপাত্রে মুখ দেবে না।'

আমি হেসে ফেললাম। 'এদেরকে সত্যিই তাহলে খাঁটি কর্সিকান কুকুর বলা যায়। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে দিয়ামানের ভদ্রতা জ্ঞানও টনটনে; ওর প্রশংসা হচ্ছে টের পেয়ে বহুক্ষণ হলো সরে গেছে দূরে—সাড়া পাচ্ছি না।'

'চিন্তা করবেন না,' বলল লুসিয়েন, 'আমি জানি কোথায় গেছে ও।'

'কোথায়?'

'লো মশিও-তে।'

ওটা আবার কি বা কোথায় জানতে চাইব কি না ভাবছি, এমন সময় বুক ফাটা আর্তনাদ শুনে চমকে থেমে দাঁড়ালাম। কুকুরের করুণ বিলাপ; এতই দুঃখের, এতই আন্তরিক যে আমার বুকটাও কেঁপে উঠল। 'কি··· কি হলো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ও কিছু না, কাঁদছে দিয়ামান।'

'কেন? কার জন্যে?'

'ওর মনিব। একবার যাকে ভালবেসেছে, মানুষ তাকে ভুলতে পারে, কুকুর পারে না।'

'ও, এবার বুঝলাম।' আবার ভেসে এল বিষণ্ণ কান্না, এবার আরও করুণ, আরও মর্মস্পর্শী। 'হ্যাঁ, আপনি বলেছেন মারা গেছে লোকটা; খুব সম্ভব ঘটনাটা যেখানে ঘটেছিল তার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি।'

'হ্যাঁ। সামনেই লো মশিও।'

'ওখানেই কবর দেয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ। কবর এখন অবশ্য মনুমেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশের নিয়ম হচ্ছে, যে এ-পথে যাবে, সে-ই একটা পাথর বা গাছের ডাল রাখবে নিহত লোকের কবরে। ফলে কালক্রমে কবরটা মাটিতে মিশে না গিয়ে বড় হতে থাকে, আরও উঁচু

হতে থাকে। কবর যত বাড়ে, আত্মীয়-পরিজনের হৃদয়ে ততই বাড়ে প্রতিহিংসার আগুন।'

তৃতীয়বার ডেকে উঠল কুকুরটা, এতই কাছে যে, সব জেনেও শিউরে উঠলাম। পথটা বাঁক নিতেই বিশ গজ দূরে চার-পাঁচ ফুট উঁচু সাদা পাথরের স্তূপ দেখতে পেলাম। এটাই লো মশিও। কবরের পায়ের কাছে গলা লম্বা করে বসে আছে দিয়ামান, চোয়াল খোলা। একটা পাথর তুলে নিল লুসিয়েন, মাথা থেকে টুপিটা খুলে এগিয়ে গেল লো মশিওর দিকে।

আমিও তাই করলাম। কাছাকাছি গিয়ে একটা ওক ডাল ভেঙে হাতে নিল লুসিয়েন, প্রথমে পাথরটা ছুঁড়ে দিল, তারপর ডালটা; তারপর খুব দ্রুত বুড়ো আঙুল দিয়ে ক্রুসচিহ্ন আঁকল বুকে, ঠিক যেভাবে সঙ্কটের মুহূর্তে আঁকতেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

ও যেভাবে যা করল, আমিও সে-সব অনুকরণ করলাম।

তারপর চুপচাপ যে-যার চিন্তায় নিমগ্ন থেকে পা বাড়ালাম সামনে। পেছনে রয়ে গেল প্রভুভক্ত দিয়ামান। মিনিট দশেক পর ওর শেষ বিলাপ কানে এল, তারপর মাথা আর লেজ নিচু রেখে পাশ কাটাল আমাদের। হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে একশো গজ দূরে কোন শিকার পয়েন্ট করে এগিয়ে গেল সেদিকে।

সাত

চলতে চলতেই টের পেলাম পথটা ক্রমে আরও খাড়া হয়ে যাচ্ছে।

রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম, কারণ বুঝতে পারছি শীঘ্রি হাত দুটোও ব্যবহার করতে হবে। লুসিয়েন অবশ্য নির্বিকার ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, যেন পথটার পরিবর্তন খেয়ালই করেনি। কয়েক মিনিট পাথুরে খাড়াই বেয়ে, কখনও ঝোপ-ঝাড় কখনও বড় গাছের শিকড় ধরে ওঠার পর ভাঙা দেয়াল ঘেরা একটা প্ল্যাটফর্মে পৌঁছলাম। বুঝলাম, শাতো দি ভিসেনতেইলো দিস্ত্রির সীমানায় ঢুকলাম।

আরও মিনিট পাঁচেক আরও খাড়া পথ বেয়ে ওঠার পর হাত বাড়িয়ে শেষ ধাপটা আমাকে টেনে তুলল লুসিয়েন।

'একজন শহুরে প্যারিসবাসীর তুলনায় রীতিমত ভাল দেখিয়েছেন আপনি, মশিয়ে,' বলল লুসিয়েন সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে।

'শেষমেষ যদিও টেনে তুলতে হয়েছে,' বললাম বিরস কণ্ঠে।

'যাই হোক, পৌঁছে গিয়েছি। চার শতাব্দী আগে এলে আমার পূর্বপুরুষরা দরজা খুলে বলত: "স্বাগতম! আসুন আমাদের শাতোয়।" আর আজ তাদের বংশধর আপনাকে ভাঙাচোরা দালান দেখিয়ে বড়জোর বলতে পারে "আসুন, আমাদের ধ্বংসাবশেষে স্বাগতম!" '

'তাহলে কি ভিসেনতেইলো দিস্ত্রির মৃত্যুর পর আপনাদের পরিবারের হাতে আসে এই শাতো?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না। তার জন্মেরও আগে এটা ছিল আমাদের সবার পূর্বপুরুষ লুসিয়েন দো ফ্রানশির বিধবা স্ত্রী বিখ্যাত সাভিলির শাতো।'

'তারপর?'

'সে এক লম্বা গল্প। দিন হলে আপনাকে শাতো দো ভালের ধ্বংসাবশেষ দেখাতে পারতাম। ওখানে থাকত সিনর দো গীদিস্। যেমন কুৎসিত ছিল চেহারা, তেমনি কুৎসিত ছিল তার লালসা। সাভিলিকে মানুষ যে পরিমাণ ভালবাসত, ঠিক

সেই একই পরিমাণ ঘৃণা করত এই গীদিসকে। এই লোক প্রেমে পড়ল সুন্দরী সাভিলির। কিন্তু মহিলার তরফ থেকে কোনও রকম সাড়া পাওয়া যায় না। শেষে একদিন সময় বেঁধে দিয়ে হুমকি দিল গীদিস: যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে রাজি না হয়, তাহলে গায়ের জোরে তুলে নিয়ে যাবে সাভিলিকে। মনে হলো রাজি হয়ে যাবে সাভিলি—গীদিসকে ডিনারে দাওয়াত করল সে। খুশি মনে চলল গীদিস দাওয়াত খেতে, সঙ্গে নিয়েছে শুধু দু'একজন চাকর; ভুলেই গেছে এই দাওয়াত আদায় করেছে সে হুমকির মাধ্যমে। ওরা ঢুকতেই বন্ধ হয়ে গেল শাতোর দরজা, পাঁচ মিনিটের মধ্যে বন্দী হলো গীদিস, পাতাল-কারাগারে তালা মেরে রাখা হলো তাকে।'

গল্প শুনতে শুনতে চারকোনা একটা প্রাঙ্গণে পৌঁছে গেলাম। চারপাশে আলোছায়ার খেলা। জোরাল চন্দ্রালোকে ছড়ানো ছিটানো ধ্বংসস্তূপ রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

ঘড়ি বের করে দেখল লুসিয়েন।

'আসুন, বসি এখানে। বিশ মিনিট আগেই পৌঁছে গেছি।'

ঘাসের ওপর আধশোয়া হয়ে বসলাম আমরা। বললাম, 'গল্পের সবটা কিন্তু বলেননি আপনি।'

'না। বলার মত বেশি কিছু নেইও আর। এরপর শুরু হলো সাভিলির নির্যাতন। পরের তিনটি মাস প্রত্যেকদিন সকাল-বিকেল পাতাল-কারাগারে যেত সে, গীদিস যে সেলে বন্দী হয়ে ছিল তার পাশের সেল-এ ঢুকে লোহার শিকের এপাশ থেকে ব্যঙ্গ করত তাকে, "গীদিস, তোমার মত এমন ভয়ঙ্কর কুৎসিত লোক কি করে ভাবতে পারলে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হব আমি?"

'তিনমাস এই অকথ্য নির্যাতন সহ্য করার পর একদিন এক পরিচারিকার সাহায্য নিয়ে পালিয়ে গেল গীদিস। তারপর লোক-লস্কর নিয়ে ফিরে এল, সাভিলিকে ধরে বড় একটা খাঁচায় বন্দী করে রোসা দি সিলাসির জঙ্গলে চৌরাস্তার ওপর রেখে দিল। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে তিনদিন পর মারা গেল সাভিলি।'

'দেখা যাচ্ছে, আপনাদের পূর্বপুরুষরা জানতেন কিভাবে প্রতিশোধ নিতে হয়। এর তুলনায় আপনাদের ছুরি মারা বা গুলি করে খুন করা অনেক নিম্নমানের প্রতিশোধ।'

'কদিন পর এই নিম্নমানের প্রতিশোধও আর থাকবে না এখানে। কেউ কাউকে খুন করবে না, কেউ বদলা নেবে না খুনের,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লুসিয়েন। 'যাই হোক, গল্পের যে পর্যায়ে আছি, তখনও ওরা আমাদের মত ভাল হয়ে যায়নি। আজাসিওতে চাচার কাছে সত্যিকার কর্সিকান হিসেবে মানুষ হচ্ছিল সাভিলির দুই ছেলে। বড় হয়েই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল গীদিসের ছেলেদের ওপর। শুরু হয়ে গেল রক্তক্ষয়। চার শতাব্দী চলল এক তুমুল পারিবারিক যুদ্ধ, শেষ হলো আঠারোশো উনিশ সালের একুশে সেপ্টেম্বর, বেলা এগারোটায়—আমার বাবা-মার রাইফেলের গায়ে তারিখটা দেখেছেন আপনি।'

'হ্যাঁ, পরিষ্কার মনে আছে। সাপারের জন্যে তাড়াহুড়ো থাকায় কারণ জানা হয়নি তখন।'

'ঘটনাটা হচ্ছে: ১৮১৯ সালে গীদিস পরিবারে জীবিত ছিল কেবল দুই ভাই; আর ফ্রানশি পরিবারে একা আমার বাবা। বাবা বিয়ে করলেন তাঁর এক চাচাতো বোনকে। বিয়ের তিন মাসের মধ্যে গীদিসরা স্থির করল সর্বাত্মক একটা আক্রমণ চালিয়ে খতম করতে হবে এই পরিবারটাকে। ঠিক হলো এক ভাই ওলমেতো রোডে লুকিয়ে থাকবে, খবর পেয়েছে বাবা আসছেন সাখতান থেকে; আর অপর

ভাই বাবার অনুপস্থিতিতে বাড়ি আক্রমণ করবে। প্ল্যানে কোনও ত্রুটি ছিল না, আক্রমণও এল যথাসময়ে; কিন্তু ঘটনা ঘটল সম্পূর্ণ বিপরীত। বাবা সাবধান ছিলেন, কারণ আগেই টের পেয়ে গেছেন কি ঘটতে চলেছে; আর মা কাজের লোকজন জড়ো করে প্রস্তুতি নিলেন প্রতি-আক্রমণের। দুজনেই তৈরি: বাবা পাহাড়ে, মা আমার ঘরে। পাঁচ মিনিটের যুদ্ধেই পতন ঘটল দুভাইয়ের, বাবার হাতে মরল একজন, মার হাতে অপরজন। শত্রুর মৃত্যুর মুহূর্তে ঘড়ি দেখলেন বাবা: বেলা এগারোটা বাজে। মা যখন দেখলেন গুলি ঠিক জায়গামত বিঁধেছে, তিনিও ঘড়ি দেখলেন: বেলা এগারোটা।

'ঠিক বেলা এগারোটায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল গীদিস পরিবার। চার শতাব্দী ধরে সম্মানের লড়াই শেষে বিজয়ী হলো ফ্রানশি পরিবার—শান্তি এল এলাকায়। ঘটনাটা স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে রাইফেল দুটোর বাঁটে ওই লেখা খোদাই করে বাবা ঘড়ির দুপাশে দুটোকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। এখনও ঝুলছে ওখানেই। সাত মাস পর যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন মা: একজন এই আপনার সামনে—কর্সিকান লুসিয়েন; আর অন্যজন হচ্ছে দার্শনিক লুই।'

চাঁদের আলোয় একটা লোকের ছায়া দেখতে পেলাম। এসে গেছে দস্যু, তার পাশে রয়েছে দিয়ামান। এমনি সময় দূর থেকে ভেসে এল সুলাকাখোর ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি—ঠিক নয়টা বাজে।

বোঝা গেল, সময়ানুবর্তিতাকে মর্যাদা দেয় ওই পাহাড়ী দস্যু।

আমরা উঠে দাঁড়ালাম।

আট

'আপনি তো একা নন, মশিয়ে লুসিয়েন?' একটু তফাতে থেমে দাঁড়িয়ে বলল দস্যু।

'এ নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না অখলান্দ; উনি আমার অতিথি। তোমার কাছে আসছি শুনে উনিও সঙ্গে আসতে চাইলেন। তোমাকে জানার সুযোগ থেকে ওঁকে বঞ্চিত করা ঠিক হবে না মনে করে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।'

'আমাদের এই পাহাড়ী দেশে আপনাকে স্বাগতম, মশিয়ে,' মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখাল দস্যু, তারপর এগিয়ে এল। লোকটা লম্বা, বুক ঢেকে আছে কুচকুচে কালো ঘন দাড়িতে।

অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে আমিও তাকে সালাম জানালাম।

'আপনারা বেশ আগেই পৌঁছে গেছেন মনে হচ্ছে?' বলল অখলান্দ।

'হ্যাঁ; বিশ মিনিট।'

'তাই হবে। দিয়ামানের কান্না শুনলাম, তারপর এই মিনিট পনেরো হবে আমাকে খুঁজে বের করেছে। দারুণ একটা বিশ্বস্ত, ভাল কুকুর, তাই না, মশিয়ে লুসিয়েন?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, অখলান্দ—ভাল এবং বিশ্বস্ত।' কথাটা বলে দিয়ামানকে আদর করে দিল লুসিয়েন।

'আপনি নিজেও পৌঁছে গেছেন আগে,' বললাম আমি, 'জানেন, মশিয়ে লুসিয়েনও হাজির। তাহলে আরও আগেই এলেন না কেন?'

'কারণ সাক্ষাতের সময় ছিল নয়টা,' জবাব দিল দস্যু। 'পনেরো মিনিট আগে বা পরে আসা অনুচিত কাজ।'

'আমাকে খোঁচানো হচ্ছে বুঝি?' হাসিমুখে বলল লুসিয়েন।

'না, মশিয়ে; আপনার আজকের ব্যাপারটায় যুক্তি আছে। সঙ্গে আরেকজন আছেন, তাঁর সুবিধা-অসুবিধা দেখতে হয়েছে। সম্ভবত সেজন্যেই এই প্রথমবারের মত সময়ের কিছুটা হেরফের হলো আপনার। আমি তো জানি, ঠিক সময়ে পৌঁছতে গিয়ে আপনি আমার জন্যে কত বার কত কষ্ট স্বীকার করেছেন।'

'সেজন্যে আমাকে ধন্যবাদ দেয়ার দরকার নেই, অখলান্দ। এবারই তো শেষ।'

'এ-ব্যাপারে কিছু কথা ছিল না আমাদের, মশিয়ে লুসিয়েন?' জানতে চাইল দস্যু।

'হ্যাঁ, এসো আমার সঙ্গে।' আমার দিকে ফিরল লুসিয়েন, 'অল্পক্ষণের জন্যে আমাদের ক্ষমা করতে হবে, মশিয়ে।'

'নিশ্চয়ই। আপনারা কাজ সারুন।'

কিছুদূর সরে গেল ওরা, চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে কথা শুরু করল।

দূর থেকে ছায়ার মত দেখাচ্ছে দুজনকে। একজন বিশ-একুশ বছর বয়সী তরুণ, অপরজন চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছরের পরিপক্ক লোক। একই ধরনের কাপড় পরে আছে দুজন; তবে জঙ্গলে জঙ্গলে কঠোর জীবন যাপন করায় অখলান্দের কাপড় কিছুটা মলিন। কি বলছে ওরা বোঝা যাচ্ছে না; প্রথমত দূরত্ব আর দ্বিতীয়ত ভাষার কারণে। কর্সিকার আঞ্চলিক ভাষা আর বিশগজ দূরত্ব সত্ত্বেও হাবভাব ও কণ্ঠস্বরের ওঠানামা শুনে এটুকু বুঝতে পারছিলাম লুসিয়েনের কথা মানতে পারছে না দস্যু, চটে উঠছে মাঝে মাঝে; কিন্তু শান্তকণ্ঠে একের পর এক যুক্তি তুলে ধরছে লুসিয়েন।

ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল অখলান্দ, ওর হাবভাব ও গলার স্বরে উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষণ। শেষপর্যন্ত কিছু একটা মন্তব্য করে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে মাথা নিচু করে রাখল অখলান্দ, তারপর ঝট্ করে মাথা তুলে বাড়িয়ে দিল ডান হাত। হ্যান্ডশেকের পর দুজন এগিয়ে এল আমার দিকে।

'প্রিয় অতিথি,' আমার নাম এখনও জানে না লুসিয়েন; ও-ও জিজ্ঞেস করেনি, আমিও বলিনি, 'ইনি হচ্ছেন অখলান্দ—আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে হাত মেলাতে চান।'

'ধন্যবাদ কিসের জন্যে?' প্রশ্ন করলাম।

'ওঁর জামিনদার হতে রাজি হওয়ায়। আমি কথা দিয়েছি যে আপনি রাজি হবেন।'

'আপনি যদি কথা দিয়ে থাকেন, তার একমাত্র অর্থ হচ্ছে আপনি মনে করেন কাজটা করা আমার উচিত। আমার কোনও আপত্তি নেই, যদিও জানি না ব্যাপারটা কি নিয়ে।'

দস্যুর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম, সে শুধু আমার তালুতে আঙুলের ডগা ছুঁইয়ে সম্মান দেখাল।

'এইবার,' বলল লুসিয়েন, 'প্যারিসে ফিরে আমার ভাইকে বলতে পারবেন যে, সবকিছুই নিষ্পত্তি করা হয়েছে তার ইচ্ছে মত, এবং চুক্তিপত্রে আপনি নিজে স্বাক্ষর করেছেন।'

'মিটমাট হয়ে গেল তাহলে?'

'না, না, এখনও হয়নি; তবে সম্ভবত হতে যাচ্ছে।'

ক্রূর হাসি দেখা গেল দস্যুর মুখে। 'শান্তি,' বলল সে, 'আপনি যখন এত করে চাইছেন। কিন্তু, মশিয়ে লুসিয়েন, মৈত্রী নয়—চুক্তিতে এই শব্দটা থাকতে পারবে না।'

'থাকবে না,' বলল লুসিয়েন, 'ওটা ভবিষ্যতের এক্তিয়ারে। যাই হোক, এবার

প্রসঙ্গ পাল্টানো যাক। আপনি কিছু শোনেননি, আমি যখন অখলান্দের সঙ্গে কথা বলছিলাম?'

'আপনারা কী বলছেন, সেটা শুনেছি কি না?'

'না। কাছে পিঠেই একটা ফেয্যান্ট কি যেন বলছিল।'

'সত্যি বলতে কি, একবার মনে হয়েছিল কর্-অর্ক্ করে উঠল কিছু, তারপর মনে হলো ভুল শুনেছি।'

'না, ভুল শোনেননি; ওই বাদাম গাছে রয়েছে পাখিটা,' বলল লুসিয়েন। 'ভালই হলো, কাল খাওয়া যাবে ওটাকে।'

'আমি অনেক আগেই ফেলে দিতাম ওকে,' বলল অখলান্দ। 'গ্রামের ওরা যদি আবার মনে করে গুলিটা অন্য কিছুকে করছি, সেই ভয়ে সামলে রেখেছি নিজেকে।'

'আমার সে ভয় নেই,' হাসিমুখে বলল লুসিয়েন। 'গ্রামের ওদেরকে জানিয়েই এসেছি আমি। তবে…' লোড করা বন্দুকটা কাঁধে ঝুলাল সে, 'প্রথম সুযোগ আপনার।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান!' আঁৎকে উঠলাম। 'আমার হাত তত ভাল না। আমি বরং পাখিটা খাওয়ার ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করব। গুলি আপনিই করুন।'

'বেশ,' বলল লুসিয়েন। 'রাতের শিকারে আপনি অভ্যস্ত নন, গুলি ঠিক নিচ দিয়ে যাবে। যাই হোক, কাল দিনে যদি আপনার তেমন কোন কাজ না থাকে, আজকের শোধ তুলে নিতে পারবেন।'

নয়

ধ্বংসস্তূপে যেদিক দিয়ে ঢুকেছিলাম তার বিপরীত দিক দিয়ে বেরিয়ে এলাম। লুসিয়েন আগে আগে। আমরা ঝোপ-ঝাড়ে ঢুকতেই আবার 'কর্-অর্ক্, কর্-অর্ক্' শুরু করল ফেয্যান্ট।

আশি গজ মত দূরে মস্ত এক বাদাম গাছে রয়েছে পাখিটা। গাছের চারপাশে এতই ঘন জঙ্গল যে এগোনো মুশকিল।

'কাছে যাবেন কি করে?' জিজ্ঞেস করলাম। 'আপনি কয়েক গজ এগোলেই টের পেয়ে সতর্ক হয়ে যাবে। সহজ হবে না।'

'না,' মাথা নাড়ল লুসিয়েন, 'খালি যদি ওটাকে দেখতে পেতাম, তাহলে এখান থেকেই গুলি করতাম।'

'এখান থেকে? বলেন কি! আশি গজ দূরের ফেয্যান্ট ফেলতে চান শট-গান দিয়ে?'

'শট দিয়ে হলে, না; বুলেট দিয়ে হলে, হ্যাঁ।'

'তা ঠিক, বুলেট হলে সম্ভাবনা আছে লাগার।'

'পাখিটা দেখতে চান?' জিজ্ঞেস করল অখলান্দ।

'হ্যাঁ। দেখতে পেলে সুবিধে হত।'

'দাঁড়ান, দুই মিনিটেই দেখতে পাবেন।' বলেই মেয়ে ফেয্যান্টের অনুকরণে ডাকতে শুরু করল অখলান্দ।

সঙ্গে সঙ্গেই নড়চড়া টের পেলাম বাদাম গাছের পাতায়। ফেয্যান্টটাকে যদিও দেখা যাচ্ছে না, বোঝা গেল লাফিয়ে এক শাখা থেকে আরেক শাখায় যাচ্ছে ওটা, ডাকছে অখলান্দের জবাবে। ক্রমে উঠছে ওপর দিকে।

শেষে বাদাম গাছের আগায় উঠে এল পাখিটা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ডাক

বন্ধ করে দিয়েছে অখলান্দ। পাখিটা ঘাড় বাঁকিয়ে খুঁজছে ওকে। ঠিক এমনি সময়ে বন্দুক তুলে এক মুহূর্ত লক্ষ্য স্থির করেই গুলি করল লুসিয়েন। পাথরের মত পড়ল নিচে ফেয্যান্ট।

'যাও, নিয়ে এসো,' দিয়ামানকে নির্দেশ দিল লুসিয়েন।

ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে ছুটল কুকুরটা, কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিয়ে এল ওটাকে মুখে করে। দেখা গেল, ঠিক মোক্ষম জায়গায় লেগেছে বুলেট।

'দারুণ দেখিয়েছেন,' বললাম আমি। 'বুলেট হোক আর যাই হোক, দোনলা বন্দুক দিয়ে এত নিখুঁত গুলি করা সহজ কথা নয়।'

'যতটা ভাবছেন ততটা কঠিনও নয়,' বলল লুসিয়েন। 'এ বন্দুকের একটা ব্যারেল রাইফ্লিং করা বলে একেবারে কারবাইনের মত গুলি হয়।'

'তবু আমি বলব, চমৎকার মেরেছেন।'

'ওঁর জন্যে এটা ছিল সহজ টার্গেট,' বলল অখলান্দ। 'একটা রাইফেল দিয়ে তিনশো গজ দূরে রাখা পাঁচ ফ্রাঁর একটা মুদ্রা ফুটো করতে দেখেছি আমি মশিয়ে লুসিয়েনকে।'

'পিস্তল-রিভলভারেও কি একই রকম দক্ষতা...'

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই উত্তর দিল অখলান্দ। 'বরং বেশি। পঁচিশ গজ দূর থেকে একটা ছোরার ফলায় সাজানো বারোটা বুলেট থেকে যে-কোন ছয়টা গুলি করে ফেলে দিতে পারেন উনি। বাকি ছয়টা যেমন ছিল তেমনি থাকবে।'

মাথার হ্যাট উঁচু করে প্রশংসা জানালাম লুসিয়েনকে।

'আপনার ভাইও কি আপনার মত...' অখলান্দ হেসে ওঠায় থেমে গেলাম।

'না।' আমার প্রশ্নের জবাব দিল লুসিয়েন, 'আমার ভাই জীবনে কোনদিন বন্দুক-পিস্তল ছুঁয়ে দেখেনি। কোনওদিন না। সেজন্যেই তো ভয়ে ভয়ে আছি, কখন কার সঙ্গে কী গোলমালে জড়িয়ে যাবে প্যারিসে। কেউ চ্যালেঞ্জ করে বসলে কর্সিকার সম্মানে ডুয়েল সে লড়বেই, ভয় পাওয়ার বা পিছিয়ে আসার পাত্র সে নয়—এবং মারা পড়বে বেঘোরে।'

ফেয্যান্টটাকে ভেলভেট কোটের বড়সড় পকেটে ভরে নিয়ে দস্যুর দিকে ফিরল লুসিয়েন, 'তাহলে চলি, অখলান্দ। কাল সকালে দেখা হবে।'

'কাল সকালে, মশিয়ে লুসিয়েন।'

'তোমার সময়-জ্ঞান আছে, জানি। কাল সকাল ঠিক দশটায়, তুমি, তোমার বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়স্বজন রাস্তার শেষ মাথায় থাকবে, ঠিক আছে? আর নদীর দিক থেকে রাস্তার ওই মাথায় থাকবে কলোনা, তার আত্মীয়স্বজন আর বন্ধু-বান্ধব। আমরা থাকব গির্জার সিঁড়ির ধাপে।'

'ঠিক আছে, মশিয়ে লুসিয়েন; অনেক কষ্ট করলেন, ধন্যবাদ। আর আপনি, মশিয়ে,' আমার দিকে ফিরে বাউ করল অখলান্দ, 'আমার জামিনদার হয়ে আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছেন, সেজন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

জঙ্গলের দিকে চলে গেল অখলান্দ, আমরা রওনা হলাম গ্রামের দিকে। কয়েক মুহূর্ত অনিশ্চয়তায় ভুগল দিয়ামান, একবার অখলান্দের দিকে চাইল, একবার আমাদের দিকে; শেষে মনোস্থির করল, আমাদের সঙ্গেই যাবে।

আমি কিছুটা ভয়ে ভয়ে ছিলাম। জানি, যে-পথে এসেছি সে-রকম খাড়াই বেয়ে নামতে হলে কপালে খারাবি আছে, কারণ ওঠার চেয়ে নামা কঠিন, আছাড় খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু, আমার মনের অবস্থা টের পেয়েই সম্ভবত, গ্রামে ফেরার জন্যে ভিন্নপথ ধরল লুসিয়েন।

এই স্বল্প পরিচয়েই আমার হৃদয়ে সম্মানের আসন দখল করে নিয়েছে ছেলেটা। এর প্রতি গভীর ভালবাসা অনুভব করছি। এত কমসময়ে এমন অনায়াসে কেউ

আমার মন জয় করে নিতে পারবে কোনদিন ভাবিনি। সহজ সরল কথাবার্তা, চালচলন; ব্যবহারে অহঙ্কার বা আত্মম্ভরিতার সামান্য ছিটেফোঁটাও নেই; সৌজন্য-বিনয়-ভদ্রতা-শালীনতা কিছুরই অভাব নেই এই গ্রাম্য যুবকের মধ্যে। সত্যি বলতে কি, এর অর্ধেকও আমি আশা করিনি।

চলতে চলতে বললাম, 'তাহলে শান্তি এল শেষ পর্যন্ত!'

'আপনি তো দেখলেনই, খুব সহজ হয়নি ওকে রাজি করানো। যখন বললাম যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবটা কলোনাই দিয়েছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, তখন কিছুটা নরম হয়েছে। কলোনারা মারা গেছে পাঁচজন লোক, আর অখলান্দদের গেছে চারজন—এটা একটা পয়েন্ট; গতকালই কলোনা শান্তি প্রস্তাব মেনে নিয়েছে আর এ মেনেছে আজ—এটা দ্বিতীয় পয়েন্ট; তবে তৃতীয় পয়েন্টটাই ওকে প্রভাবিত করেছে সবচেয়ে বেশি—কলোনা আগামী কাল সবার সামনে অখলান্দের হাতে একটা জীবন্ত মোরগ দিতে রাজি হয়েছে; অর্থাৎ পরোক্ষভাবে নিজের দোষ মেনে নিচ্ছে কলোনা। কাজেই আপোসে রাজি ওকে হতেই হলো।'

'আগামীকালই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হচ্ছে?'

'আগামীকাল সকাল দশটায়। কাজেই দেখুন, কপালটা আপনার নেহায়েত খারাপ নয়—ভঁদত দেখতে এসেছিলেন, শুধু ভঁদত নয়, তার শেষও দেখে যেতে পারছেন।' তিক্ত হাসি হাসল লুসিয়েন। 'কলহ-বিবাদ-রক্তক্ষয়-প্রতিশোধ—এসবের কিন্তু দরকার আছে। গত চারশো বছর এছাড়া আর কোনও আলোচ্য বিষয় ছিল না কর্সিকাবাসীদের। আপোস একটা দুর্লভ ঘটনা।'

হা-হা করে হেসে উঠলাম।

'এই দেখুন, হাসি এসে যাচ্ছে আপনার,' ম্লানকণ্ঠে বলল যুবক। 'আমাদের কারবার দেখে হাসি পাচ্ছে আপনার, ঠিকই আছে, আমরা তো হাসির পাত্রই।'

'না,' হাসি সংবরণ করলাম। 'কর্সিকানদের মত এত চমৎকার মানুষ আর কোথাও দেখিনি আমি। হাসছি অন্য কারণে। নিজের ওপরই রেগে গেছেন আপনি নিজের সাফল্যে।'

হাসি ফুটল যুবকের মুখে। 'সত্যি, ঠিক ধরেছেন। ভাষাটা জানা থাকলে আপনি আমার বাক-চাতুরীর প্রশংসা না করে পারতেন না। কিন্তু দশটা বছর পর আবার আসুন, দেখবেন, এলাকার সবাই ফ্রেঞ্চ বলছে—দুঃখটা এখানেই।'

বুঝলাম, এজন্যেই একে সত্যিকার কর্সিকান হিসেবে মেনে নিয়েছে সবাই।

দশ

আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল গ্রিফো।

কেউ কিছু বলার আগেই প্রভুর পকেট হাতড়ে ফেয্যান্টটা বের করে নিল সে। গুলির আওয়াজ পেয়েছে। মাদাম দো ফ্রানশি নিজের ঘরে গেছেন, কিন্তু শুয়ে পড়েননি এখনও; গ্রিফো বলল, শুতে যাওয়ার আগে লুসিয়েন যেন তাঁর সাথে দেখা করে যায়।

আমার কিছু লাগবে কি না জানতে চাইল লুসিয়েন, আমি 'না' বলায় চলে গেল মার সঙ্গে দেখা করতে।

ঘরে ফিরে ধীরে-সুস্থে জামা-কাপড় ছাড়লাম, তারপর ভবিষ্যৎ আইনজ্ঞের বুকশেল্‌ফ্ থেকে ভিক্তর হুগোর 'ওরিয়েন্টাল্‌স্' নিয়ে শততম বারের মত পড়তে শুরু করলাম। প্রথম পরিচ্ছেদটা মাত্র শেষ করেছি, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে

পেলাম। আমার ঘরের দরজায় এসে থামল আওয়াজটা। বুঝলাম, শুভরাত্রি জানাতে এসেছে লুসিয়েন, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছি মনে করে দ্বিধা করছে ঘরে ঢুকতে।

'আসুন, চলে আসুন,' ডাকলাম।

'মাফ করবেন,' বলল লুসিয়েন, 'আপনার সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় কিছুটা কর্কশ ব্যবহার করে ফেলেছি—তাই ক্ষমা চাইতে এলাম। তাছাড়া, মনে হচ্ছে, কিছু প্রশ্ন এখনও রয়েছে আপনার মনে, যার সদুত্তর আমি দিইনি...'

'না, না। আপনি অযথা নিজেকে অপরাধী ভাবছেন। আমিই বরং ভাবছিলাম আপনাকে যথেষ্ট জোরাল ভাবে ধন্যবাদ জানানো হয়নি। এক সন্ধ্যাতেই আপনি আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমার এই কর্সিকা-ভ্রমণকে সার্থক করে দিয়েছেন। শুধু একটা ব্যাপারে আমার মনে কিছু প্রশ্ন ছিল, কিন্তু আমি স্থির করেছি, ওসব নিয়ে আর আপনাকে বিব্রত করব না।'

'কেন?'

'কারণ, সেটা হবে চরম অভদ্রতা। তাছাড়া, সব প্রশ্নেরই উত্তর জানতে হবে...'

'কেন নয়?' বাধা দিল লুসিয়েন। 'আপনি যেটাকে অভদ্র প্রশ্ন মনে করছেন, আমি হয়তো সেটাকে তা মনে করব না। কৌতূহল না মিটলে মনে নানা রকম সন্দেহ এসে দানা বাঁধে, আমার প্রতি সেটা সুবিচার হবে না। সন্দেহ পুষে না রেখে সত্যটা জেনে নেয়া অনেক ভাল না? তার চেয়ে বরং আমাকে প্রশ্ন করে উত্তরগুলো জেনেই নিন।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি জাদু জানেন—এটা ছাড়া আর কোনও সন্দেহ আমার মনে দানা বাঁধেনি।'

প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়ল লুসিয়েন।

'এবার আপনার মত আমিও কৌতূহলী হয়ে উঠলাম,' বলল লুসিয়েন হাসি থামিয়ে। 'জাদু জানি মানে?'

'মানে, শুধু একটা বিষয়ে—তাছাড়া আমার প্রতিটি প্রশ্নের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে উত্তর দিয়েছেন আপনি। চমৎকার অস্ত্রগুলো দেখিয়ে কোন্‌টা কার কাছ থেকে কিভাবে এসেছে বুঝিয়ে বলেছেন।'

'এক নম্বর।'

'দুটো কারবাইনে একই তারিখ খোদাই করা কেন, বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।'

'দুই।'

'আপনারা দুই ভাই কেন একে অন্যের অনুভূতি টের পান বলেছেন আমাকে। জন্মের সময় যে আপনারা এক ছিলেন...'

'হ্যাঁ, এটা তৃতীয়।'

'তারপর খাবার টেবিলে মাদাম দো ফ্রানশি যখন গত কয়েকটা দিন আপনার শরীর-মন খারাপ থাকা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেন, জানতে চাইলেন আপনার ভাই বেঁচে আছেন এ-ব্যাপারে আপনি নিঃসন্দেহ কি না; আপনি বললেন, ও যদি মারা যেত, তাহলে তো ওকে দেখতেই পেতাম।'

'হ্যাঁ, ঠিক। এই কথাটাই বলেছি।'

'কিন্তু এর ব্যাখ্যা আমার কাছে পরিষ্কার নয়।'

লুসিয়েনের মুখটা এতই গম্ভীর হয়ে উঠল যে থমকে গেলাম। চট্ করে বললাম, 'এই দেখুন, অনুচিত প্রশ্ন করে ফেলেছি। যা বলেছি ভুলে যান।'

'না।' মাথা নাড়ল লুসিয়েন। 'বাস্তব-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হওয়াই স্বাভাবিক। চার শতাব্দী ধরে চলে আসছে, এমন একটা

প্রাচীন পারিবারিক ঐতিহ্যকে আপনি গাঁজাখুরি গল্প মনে করেছেন জেনে খারাপই লাগছে। তবে আপনাকে দোষ দিচ্ছি না।'

'আমাকে ভুল বুঝবেন না দয়া করে,' বললাম আমি। 'প্রাচীন প্রথা বা ঐতিহ্যকে আমি যথেষ্ট সম্মান করি। তাছাড়া এমন অনেক ব্যাপার আছে, অসম্ভব বা অবাস্তব ব্যাপার, যা আমি অকপটে বিশ্বাস করি।'

'ভূত-প্রেতে বিশ্বাস আছে আপনার?'

'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। শুনবেন?'

'বলুন, তাতে আমার সুবিধে হবে।'

'আমার বাবা মারা যান ১৮০৭ সালে; আমার তখন সাড়ে তিন বছর বয়স। ডাক্তার যখন জানিয়ে দিল রোগীর মৃত্যুর আর বেশি দেরি নেই, তখন আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো এক আত্মীয়ার ছোট্ট বাসায়। আমাকে ঘুম পাড়িয়ে পাশের খাটে শুয়ে পড়লেন মহিলা। কি ঘটছে, কেন আমাকে সরিয়ে দেয়া হলো আত্মীয়ার বাসায়, কিছুই তখন বুঝি না। অনেক রাতে হঠাৎ দরজায় তিনটে জোরাল টোকা পড়তে ঘুম ভেঙে গেল, বিছানা থেকে নেমে চললাম দরজার দিকে।

'আমার আত্মীয়াও জেগে গেছে টোকার শব্দে, আমাকে জিজ্ঞেস করল: কোথায় যাও?

'দেখলাম ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বৃদ্ধার মুখ। কারণ সে জানে, রাস্তার দিকের দরজা তালা মারা আছে, কাজেই এই ভেতরের দরজায় কারও পক্ষে টোকা দেয়া সম্ভব নয়।

'বললাম: দরজা খুলতে যাচ্ছি। আব্বু চলে যাচ্ছে, তাই বিদায় জানাতে এসেছে।

'লাফিয়ে উঠে আমাকে ধরে জোর করে টেনে এনে শুইয়ে দিল মহিলা, আমি কাঁদাকাটি করলাম, অনেক করে বললাম আব্বুকে দেখব, কিন্তু মহিলা আমার কথা শুনল না।'

'আর কোনদিন আসেনি ছায়ামূর্তি?'

'নাহ্, আর কোনদিন না। অনেক ডেকেছি, কিন্তু আসেনি আর।'

'যাক, এই পরিবারের আমরা এ-ব্যাপারে আপনার তুলনায় ভাগ্যবান,' মৃদুহেসে বলল লুসিয়েন।

'আপনারা মৃত আত্মীয়ের দেখা পান?'

'যখনই বড়সড় কোনও ঘটনা ঘটে বা ঘটতে যায়।'

'কারণটা কি? আপনাদের প্রতি এই যে বিশেষ আনুকূল্য...'

'কারণ বলতে পারব না। তবে ব্যাপারটা প্রাচীনকাল থেকে ঘটে আসছে, এটুকু বলতে পারি। দুই ছেলে রেখে সাভিলি মারা যান, আপনাকে বলেছি।'

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'এই দু'ভাই পরস্পরকে অন্তর দিয়ে ভালবাসত। শপথ নিয়েছিল একসাথে থাকবে, কোনও কিছুই, এমন কি মৃত্যুও তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। কী এক গোপন মন্ত্র পাঠ করে তারা নিজ নিজ রক্ত দিয়ে পার্চমেন্ট কাগজে লিখে রেখেছিল, তাদের মধ্যে যে আগে মারা যাবে সে পরবর্তীতে যে-কোনও সঙ্কটের মুহূর্তে অপর জনকে দেখা দেবে। এর তিনমাস পরেই একভাই খুন হয় অ্যামবুশে। সেই একই মুহূর্তে তার কাছে চিঠি লিখছিল অপর ভাই। চিঠিটা খামে ভরে গালা দিয়ে মুখ আটকে সিগনেট রিঙ দিয়ে যেই সীল দিতে যাবে, পিছনে একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে তার ভাই, কিন্তু কাঁধে কোনও চাপ পড়ছে না। নিজের অজান্তেই খামটা এগিয়ে দিল সে, ভাই সেটা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। নিজ মৃত্যুর সময় আবার তাকে দেখেছিল সে। বোঝা যায়,

দুভাই যে চুক্তি করেছিল সেটা তাদের দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তাদের উত্তরপুরুষদের ওপরও বর্তেছে। কারণ, এর পর থেকে যে-কোন বড় ঘটনা ঘটতে নিলেই আসে তারা।'

'আপনি নিজে দেখেছেন এক-আধজনকে?'

'না। তবে, যেহেতু আমার বাবার মৃত্যুর আগে তাঁর বাবা এসে আগাম খবর দিয়েছিলেন আমার বিশ্বাস এ-সুবিধে আমরাও ভোগ করব; কারণ আমরা এমন কোনও অন্যায় করিনি যে এই অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হব।'

'শুধু পরিবারের পুরুষরাই দেখতে পায়?'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য!'

'এবং সত্য।'

অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলাম ওর দিকে। দৃঢ়, শান্ত কণ্ঠে ও এমন কিছু বলছে যা বিশ্বাস করা কঠিন। হ্যামলেটের সেই বিখ্যাত লাইনগুলো আবৃতি করলাম:

'দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ, হোরেশিও,
দ্যান আর ড্রেম্ট্ অভ্ ইন ইয়োর ফিলোসফি।'

প্যারিসে বসে এসব শুনলে একে চালবাজ এক ছোকরা হিসেবে ধরে নিতাম; কিন্তু কর্সিকার মাঝখানে ছোট্ট, অখ্যাত এই গ্রামে এসব শুনে কেমন যেন দ্বিধায় পড়ে গেলাম: ছেলেটা কি এসব গাঁজাখুরি গল্প সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে নিজেকে ঠকাচ্ছে, নাকি সত্যিই অসাধারণ কোনও ক্ষমতা রয়েছে এদের মধ্যে?

'তাহলে,' অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল যুবক, 'আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ,' বললাম। 'আপনি যে বিশ্বাস করে আপনাদের পারিবারিক গোপন কথা আমাকে বলেছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আমি কথা দিচ্ছি, এসব কথা গোপন থাকবে।'

'কিসের গোপন কথা?' হাসল লুসিয়েন। 'কোনও রাখ-ঢাক নেই, গ্রামের যে-কোনও লোককে জিজ্ঞেস করুন, এই একই গল্প শুনবেন। এখানে সবাই সব জানে। তবে হ্যাঁ, প্যারিসে গোপনীয়তার দরকার আছে। ওখানে যদি আমার ভাই এই ক্ষমতার বড়াই করে তাহলে মেয়েরা মূর্ছা যাওয়ার ভান করবে, ছেলেরা হাসবে তাচ্ছিল্যের হাসি।'

একথা বলেই বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল লুসিয়েন।

খুবই ক্লান্ত হয়ে আছি, কিন্তু সহজে ঘুম এল না চোখে; যাও বা এল, অস্বস্তিকর, ভাঙা-ভাঙা। সারাদিনে যত লোকের সংস্পর্শে এসেছি সবাইকে স্বপ্নে দেখলাম, কিন্তু তাদের চালচলন উদ্ভট, অর্থহীন। সকালের দিকে একটানা কিছুক্ষণ গাঢ় ঘুম হলো, তারপর হঠাৎ জেগে গেলাম।

বেল বাজালাম। গরম পানি নিয়ে গ্রিফো এসে ঢুকল।

জানা গেল, ইতোমধ্যে দুই-দুইবার আমার খোঁজ করেছে লুসিয়েন, গ্রিফোকে জানিয়েছে, ঠিক সাড়ে নটায় আসবে এ-ঘরে। ঘড়িতে দেখলাম, নয়টা বেজে পঁচিশ; কাজেই বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

ধোপ দুরস্ত ফরাসী পোশাক পরে ফুলবাবু সেজে এল সে। কালো কোট, সাদা প্যান্ট, জমকালো ওয়েইস্টকোটে দারুণ মানিয়েছে ওকে।

'কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল সে, 'অসভ্য ভাব কিছুটা ঢাকা পড়েছে?'

'চমৎকার লাগছে। সত্যিই। আজাসিওতে এত ভাল দরজি আছে জানতাম না।'

'খাস প্যারিসের হুমান্‌স্‌ থেকে এসেছে এগুলো। আমাদের দু'ভাইয়ের একই মাপ। কাজেই নিজের মাপের পুরো এক ওয়ারড্রোব কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছে লুই আমাকে। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে বের করি। এই যেমন আজকের এই মহান শান্তিচুক্তি উপলক্ষে বের করলাম এক সেট।'

আমি তৈরি হতে হতে পৌনে দশটা বেজে গেল।

'চলুন, চলুন,' বলল লুসিয়েন। 'মজা দেখতে হলে আগেভাগেই গিয়ে সীট দখল করা দরকার। নাকি নাস্তা সেরে ধীরেসুস্থে আসবেন?'

'এগারোটার আগে নাস্তা কমই খাই। অতএব দুটোর জন্যেই যথেষ্ট সময় রয়েছে হাতে। চলুন।'

টুপিটা তুলে নিয়ে অনুসরণ করলাম ওকে।

এগারো

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়েই গ্রামের স্কোয়্যারটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গতকালের নির্জন স্কোয়্যার আজ লোকে-লোকারণ্য হয়ে গেছে। একটু লক্ষ করতেই বোঝা গেল পুরুষ নেই একজনও—সব মেয়ে বা বারো বছরের কম বয়েসী শিশু।

গির্জার সবচেয়ে নিচের ধাপে কোমরে তিনরঙা বেল্ট পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন—ইনিই মেয়র।

সামনের বারান্দায় কালো পোশাক পরা একজনকে দেখা গেল, একটা টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছেন, হাতে কয়েক শীট কাগজ। ইনি উকিল, কাগজে লেখা রয়েছে আপোস চুক্তিনামা।

অখলান্দদের মুরুব্বির সঙ্গে টেবিলের একপাশে বসলাম আমি। টেবিলের অপরদিকে বসেছে কলোনার মুরুব্বিরা। উকিলের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লুসিয়েন—সে দুই পক্ষেরই লোক। পেছনে, গির্জার পুবদিকে যাজক তৈরি হচ্ছেন 'মাস্‌' বলার জন্যে।

দশটা বাজল ঘড়িতে।

সঙ্গে সঙ্গে জনারণ্যে উত্তেজনার লক্ষণ দেখা গেল। রাস্তার শেষ দু'মাথায় সবার নজর। দেখা গেল পাহাড়ের দিক থেকে অখলান্দ, আর নদীর দিক থেকে কলোনা আসছে—দুজনের পেছনেই রয়েছে দলবল; তবে কথা অনুযায়ী, সঙ্গে অস্ত্র আনেনি কেউ।

দুই দলের প্রধানের শারীরিক গঠনে বৈপরীত্য লক্ষ করার মত। অখলান্দ সুঠাম, দীর্ঘদেহী, কর্মঠ, গায়ের রঙ কিছুটা গাঢ়। আর কলোনা হচ্ছে বেঁটে, মোটা, শক্তপোক্ত, কোঁকড়া চুল-দাড়ি লালচে।

দুজনের হাতে রয়েছে একটা করে জলপাইয়ের শাখা, শান্তির প্রতীক। মেয়র তাঁর কবি মনের ছোঁয়া রেখেছেন এ ব্যাপারে।

কলোনার অপর হাতে দেখা গেল সাদা একটা জ্যান্ত মোরগ, পা ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে। দশ বছর আগে যে মোরগ নিয়ে ঝগড়ার উৎপত্তি, সেটির বদলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেবে সে এটা অখলান্দকে।

এই জ্যান্ত মোরগ ফেরত দেয়ার ব্যাপারে কলোনার ঘোর আপত্তির মুখে আপোস-আলোচনা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল প্রায়—মরা মোরগের পরিবর্তে জ্যান্ত মোরগ দিতে হলে তার মান থাকে না। তার খালা মরা মোরগ ছুঁড়ে মেরেছিল

অখলান্দের চাচাত বোনের মুখে, তখনই ঝগড়ার সূত্রপাত; কাজেই সে মরা মোরগ দেবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য লুসিয়েনের যুক্তির কাছে নতি স্বীকার করে জ্যান্ত মোরগ ফেরত দিতে রাজি হয়েছে সে।

দুজনকে দেখতে পাওয়া মাত্র ঢং-ঢং করে বেজে উঠল গির্জার ঘণ্টা খুশি-খুশি ছন্দে।

কিন্তু অখলান্দ আর কলোনা যখন পরস্পরকে দেখতে পেল, মুহূর্তে বিকৃত হয়ে গেল ওদের চেহারা, দুজনেরই চোখে-মুখে স্পষ্ট ঘৃণার প্রকাশ; তবে এগোনো বন্ধ করল না কেউই। গির্জার দরজার সামনে এসে থামল দুজন একে অন্যের থেকে গজ চারেক দূরে। ঠিক তিনদিন আগে এই দুজন যদি পরস্পরের একশো গজের মধ্যে আসত, দুজনের একজন এতক্ষণে শুয়ে থাকত মাটিতে।

কয়েক মিনিট কাটল চুপচাপ। কেবল এই দু'দলই নয়, চুপ হয়ে গেছে জনতাও। আপোস রফার উদ্দেশ্যে এলেও, ভেতরে ভেতরে সবাই উত্তেজিত—কারও মধ্যে শান্তির কোন ভাব দেখা যাচ্ছে না।

কথা বলে উঠলেন মেয়র।

'এসো, কলোনা,' ডাকলেন তিনি, 'তুমি নিশ্চয়ই জানো, তোমাকেই প্রথমে কথা বলতে হবে।'

নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে, যেন ইচ্ছের বিরুদ্ধে, কর্সিকার আঞ্চলিক ভাষায় কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করল সে। যতটুকু বুঝলাম: কোলোনা দুঃখ প্রকাশ করল যে সামান্য কারণে সুপ্রতিবেশী অখলান্দের সঙ্গে ভঁদতে জড়িয়ে পড়া তার উচিত হয়নি। এর পরিসমাপ্তি কামনায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে সে হাতের মোরগটা তাকে দিতে চায়।

কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অখলান্দ, তারপর মোরগটা নিয়ে সে-ও আঞ্চলিক ভাষায় উত্তর দিল: আগের কিছুই মনে না রেখে এখন থেকে সে মেয়রের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত, মশিয়ে লুসিয়েনের মধ্যস্থতায় তৈরি, উকিলের লেখা এই পবিত্র আপোসনামার কথাই শুধু মনে রাখবে।

আবার কিছুক্ষণের জন্যে সবাই চুপ।

'আমি যতদূর জানি,' বললেন মেয়র, 'এবার তোমাদের দুজনের হ্যান্ডশেক করার কথা।'

মুহূর্তে দুজনের হাত চলে গেল তাদের পেছনে।

ধাপ থেকে নেমে এলেন মেয়র, পেছন থেকে টেনে সামনে আনলেন কলোনার ডানহাত; একই ভাবে টেনে আনলেন অখলান্দের ডানহাত, তারপর অনেক কষ্টে—কষ্টটা অবশ্য তিনি হাসি দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করলেন—দুই হাত এক করলেন।

সুযোগ বুঝে এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন উকিল। দুজনের হাত ধরা অবস্থায় জোরে জোরে পড়তে শুরু করলেন:

'সাখতান প্রদেশের সুলাকাখো গ্রামের গির্জার সামনের স্কোয়্যারে আয়োজিত সভায়, নোটারি রয়্যাল গিসেপ-আনতোনিও সাখোলা, মাননীয় মেয়র, উভয় পক্ষের মধ্যস্থতাকারী, জামিনদার এবং সমবেত জনগণের সম্মুখে,

'গাতানো-অখসো অখলান্দ, ওরফে অখলান্দ

'এবং মাখকো-ভাঁসনযি কলোনা, ওরফে শিয়োপন

'পবিত্রতা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়ে অঙ্গীকার করছেন যে:

'আজ, ১৮৪১ সালের ৪ মার্চ থেকে বন্ধ হলো তাঁদের মধ্যেকার দীর্ঘ দশ বছর ধরে স্থায়ী ভঁদত

'এবং আজ থেকে তাঁরা শত্রুতা ভুলে সুপ্রতিবেশীসুলভ ও বন্ধুভাবাপন্ন

পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবেন

'এই মর্মে নিম্নবর্ণিত সাক্ষীগণ, যথা: মেয়র মশিয়ে পোলো আখবখি, মধ্যস্থতাকারী মশিয়ে লুসিয়েন দো ফ্রানশি, উভয়পক্ষের দুইজন জামিনদার ও নোটারির সম্মুখে এই চুক্তিপত্রে সহি সম্পাদন করলেন।

'সুলাকাখো, ৪ মার্চ, ১৮৪১ সাল।'

দেখলাম, বুদ্ধিমান উকিল কলোনাকে বেশি ছোট করা হয়ে যায় বলে মোরগ সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। তাতে খুশি হলো কলোনা, গম্ভীর হয়ে উঠল অখলান্দ। হাতের মোরগের দিকে তাকাল সে একবার, বোঝা গেল ওটা কোলোনার মুখে ছুঁড়ে মারার জন্যে হাতটা নিশপিশ করছে ওর; কিন্তু লুসিয়েন দো ফ্রানশি একবার ঘাড় ফিরে তাকাতেই সামলে নিল নিজেকে।

মেয়র বুঝলেন, আর সময় নষ্ট করা যায় না, কখন আবার কী নিয়ে ঝামেলা বেধে যায় ঠিক নেই—দু'হাতে দুজনকে ধরে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওপরে উঠে এলেন। কে আগে সই করবে তা নিয়ে যাতে কোনও বিতর্ক না ওঠে, তাই নিজেই কলম তুলে নিয়ে প্রথম স্বাক্ষর করলেন—যেন প্রথমে সই করাটা মস্ত সম্মানের ব্যাপার—তারপর কলমটা ধরিয়ে দিলেন অখলান্দের হাতে। অখলান্দ সই করে দিল লুসিয়েনের হাতে, সে স্বাক্ষরের পর দিল কলোনার হাতে।

তারপর বাকি আমরা কজন স্বাক্ষর করলাম।

এবার গির্জায় প্রবেশ করল দুই মহানায়ক। একজনের থেকে বেশ অনেকটা দূরে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে আরেকজনের। খেয়াল করলাম, লুসিয়েনের চেহারা থেকে উৎকণ্ঠা দূর হয়ে একটা খুশি-খুশি ভাব ফিরে এসেছে; দায়িত্ব শেষ, শুধু মানুষ নয়, ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে আপোস হয়ে গেছে।

'মাস্' শেষ হতে গির্জা থেকে বেরিয়ে এল অখলান্দ ও কলোনা। দরজার কাছে আবার একবার ওদের হাত মিলিয়ে দিলেন মেয়র। তারপর যে-যার বন্ধু-বান্ধব সহ দিনের আলোয় নিজ নিজ বাড়িতে গিয়ে ঢুকল তারা—গত কয়েক বছর রাতেও যেখানে ঢুকতে পারেনি।

আমরাও বাড়ি ফিরে এলাম। আমার প্রতি লুসিয়েনের বিশেষ মনোযোগ ও খাতির-যত্ন দেখে বুঝতে পারলাম, যখন স্বাক্ষর করছিলাম, ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে আমার নামটা পড়েছে ও এবং চিনতে পেরেছে।

ওকে জানালাম, ডিনারের পর-পরই আমি রওনা হয়ে যেতে চাই। মা ও ছেলে আরও কদিন বেড়িয়ে যাবার জন্যে অনেক করে অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমার পক্ষে অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হলো না, কারণ প্যারিস থেকে ফেরার জন্যে জোরাল তাগিদ এসেছে। আমার লেখা নাটক 'এ ম্যারিজ আন্ডার লুই ফিফ্টীন' মঞ্চস্থ হতে চলেছে, রিহার্সেলে আমার থাকা একান্তই জরুরী।

লুসিয়েনকে বললাম, 'ইচ্ছে করলে আপনার ভাইয়ের জন্যে একটা চিঠি দিতে পারেন আমার হাতে।'

লুসিয়েন চিঠি লিখে দিল। মাদাম দো ফ্রানশি অনুরোধ করলেন, চিঠিটা যেন আমি নিজ হাতে তাঁর ছেলের কাছে পৌঁছাই। আনন্দের সঙ্গে রাজি হলাম। মশিয়ে লুই দো ফ্রানশির ফ্ল্যাট আমার বাড়ি থেকে খুব বেশি দূর নয়।

লুসিয়েনের ঘরে সাজানো অস্ত্রগুলো শেষবারের মত দেখতে চাইলাম। ও নিজে আমাকে নিয়ে গেল ওর ঘরে। একহাত ঘুরিয়ে সব জিনিসপত্র দেখিয়ে বলল, 'যেটা খুশি তুলে নিন, ওটা আপনার।'

একটু আঁধার মত জায়গায় হুকে ঝুলানো ছোট্ট একটা ড্যাগার তুলে নিলাম, আশা করলাম এটা নিশ্চয়ই ওর কাছে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু হবে না। গতকাল ও আজ দুদিনই লুসিয়েনকে আমার ট্র্যাভেলিং বেল্টের দিকে কয়েকবার প্রশংসার

দৃষ্টিতে তাকাতে দেখেছিলাম, তাই হান্টিং নাইফ সহ ওটা খুলে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। লুসিয়েনের সৌজন্যবোধ তীক্ষ্ণ, আমাকে দিয়ে সাধাসাধি না করিয়ে খুশিমনে নিল উপহারটা।

এই সময় গ্রিফো এসে হাজির হলো দরজায়। জানাল, ঘোড়ায় জিন চাপানো হয়েছে, আমার গাইড অপেক্ষা করছে নিচে। গ্রিফোর জন্যে একটা উপহার আলাদা করে রেখেছিলাম, এটাও হান্টিং নাইফই, তবে ফলার দুপাশে দুটো পিস্তল রয়েছে, পিস্তলের লক ও যন্ত্রপাতি লুকানো রয়েছে বাঁটের ভেতর। উপহার পেয়ে এত খুশি হতে আর কাউকে দেখিনি আমি।

নিচে নামতেই দেখলাম সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে মাদাম দো ফ্রানশি। বিদায় জানাতে এসেছেন আমাকে। সসম্মানে তাঁর হাতের পিঠে চুমু খেয়ে বিদায় নিলাম। দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল লুসিয়েন।

'অন্য কোনও দিন হলে,' বলল সে, 'আমার ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে অন্তত পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত এগিয়ে দিতাম আপনাকে; কিন্তু আজ সুলাকাখো থেকে নড়তে পারছি না, পাছে নতুন-পাতানো বন্ধুদের কেউ কিছু করে বসে।'

'ঠিক বলেছেন,' বললাম, 'সতর্ক থাকার সত্যিই দরকার আছে। আপনার এই প্রায়-অসাধ্য মিলন-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। কর্সিকার একটি আশ্চর্য ও বিরল ঘটনা চাক্ষুষ করে গেলাম।'

'তা ঠিক, তবে কোনও সন্দেহ নেই, চুক্তি সইয়ের মুহূর্তে আমাদের সমস্ত পূর্বপুরুষ কবরের ভেতর মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল অন্যদিকে।'

'কেন চুক্তি সইয়ের কি দরকার, মুখের কথাই তো যথেষ্ট ছিল—এই জন্যে?'

'না। এই জন্যে যে, তারা হলে কিছুতেই কোনও আপোসে যেত না।' এই বলে হাত বাড়িয়ে দিল সে আমার দিকে। হ্যান্ডশেক করলাম আমরা।

'আপনার তরফ থেকে আপনার হয়ে আপনার ভাইকে আলিঙ্গন করার অধিকার আমি পেতে পারি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'নিশ্চয়ই, যদি আপনার খুব অসুবিধে না হয়।'

'বেশ, তাহলে আমাদের দুজনকে প্রথমে আলিঙ্গন করতে হবে; কারণ, যা পাইনি তা আমি পৌঁছে দেব কি করে?'

দুজন দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

'নিশ্চয়ই আবার কোনদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে?' বললাম আমি। ছেলেটাকে সত্যিই ভাল লেগেছে আমার।

'নিশ্চয়ই। যদি আবার কর্সিকায় আসো।'

'না, আমি বলছিলাম, তুমিও তো কখনও প্যারিসে আসতে পারো?'

'সেটা অসম্ভব। আমি কোনদিন যাব না ওখানে।'

'যাই হোক, তোমার ভাইয়ের টেবিলে আমার কার্ড রেখে এসেছি। ঠিকানাটা মনে রাখবে, কথা দাও।'

'কথা দিচ্ছি, যদি কোনও কারণে মেইনল্যান্ডে যেতে বাধ্য হই, তোমার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করব।'

'তাহলে এই কথাই থাকল।'

আরেকবার হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিলাম। যতক্ষণ আমাকে দেখা গেল, দরজায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকল লুসিয়েন।

কোনও শব্দ নেই গ্রামের কোথাও, তবু অনুভব করলাম, প্রতিটি বাড়ি থেকে যেন উত্তেজনার কম্পন বেরিয়ে আসছে। চলতে চলতে প্রতিটি বাড়ির দরজার দিকে তাকালাম, প্রতিমুহূর্তে আশা করছি অখলান্দকে দেখতে পাব। কিন্তু না, সব বাড়ি ছাড়িয়ে এলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওর জামিনদার হিসেবে ভেবেছিলাম ওর

কাছ থেকে একটা ধন্যবাদ আমার প্রাপ্য ছিল।

যাকগে, আজকের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের তীব্র উত্তেজনা, এবং আত্মীয়-বন্ধুদের নানান ধরনের চাপ সামাল দিতে গিয়ে নিশ্চয়ই আমার কথা ভুলে গেছে বেচারা—এই মনে করে ওকে ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু বিশিসানো হীথ-এ পৌঁছেই দেখলাম রাস্তার পাশের ঝোপের আড়াল থেকে লম্বা এক লোক এসে দাঁড়াল রাস্তার মাঝখানে। মুহূর্তে চিনতে পারলাম অখলান্দকে, যাকে একটু আগেও অকৃতজ্ঞ বলে মনে হচ্ছিল।

লক্ষ করলাম, এরই মধ্যে কাপড় পাল্টে ভিসেনতেইলোর ধ্বংসস্তূপে গত রাতে যে-পোশাকে দেখেছিলাম সেইসব পরেছে দস্যু; কার্ট্রিজ বেল্টের সঙ্গে ঝুলছে পিস্তল, হাতে রাইফেল। আমি বিশ গজের মধ্যে পৌঁছতেই টুপি খুলে হাতে নিল সে, আমিও ওকে অপেক্ষায় না রেখে স্পার খুঁচিয়ে ঘোড়ার গতি বাড়ালাম।

'মশিয়ে,' বলল সে, 'আমার ধন্যবাদ না নিয়েই আপনি সুলাকাখো ছেড়ে যাবেন তা হতেই পারে না। আমার মত একজন অতি সাধারণ কৃষকের জামিনদার হয়ে আপনি আমাকে যে কতবড় সম্মান দিয়েছেন, ওই অনুষ্ঠানের উত্তেজনায় সেটা প্রকাশ করবার ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম—সেজন্যে এখানে এসে বসে আছি আপনার অপেক্ষায়।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে,' বললাম আমি, 'এর জন্যে আপনার নিজেকে এত কষ্ট দেয়ার কোনও দরকার ছিল না; সুযোগটা পেয়ে আমিই সম্মানিত বোধ করেছি।'

'কষ্ট? বলেন কি, মশিয়ে?' আকাশ থেকে পড়ল অখলান্দ। 'ওখান থেকে পালিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। এতগুলো বছর খোলা জায়গায় কাটিয়ে, পাহাড়ী বাতাসে শ্বাস টেনে এখন অন্য যে-কোনও জায়গায় দম বন্ধ হয়ে আসে। গ্রামের ওই বাড়িতে ঢুকে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ছাদটা ধসে পড়ল মাথায়।'

'কিন্তু এখন তো স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে হবে আপনাকে। শুনেছি বাড়িঘর, জমিজমা আর চমৎকার আঙুর খেত আছে আপনার।'

'কথা সত্যি, তবে আমার বোনই দেখেশুনে রাখে বাড়িটা, আঙুর খেত দেখাশোনার জন্যেও লোক আছে। আমরা কর্সিকানরা তো কাজ করি না।'

'কি করেন তাহলে?'

'একটু আধটু কাজের দেখাশোনা করি, বাকি সময় রাইফেল নিয়ে ঘুরে বেড়াই, শিকার করি সুযোগ পেলে।'

'বেশ, মশিয়ে অখলান্দ,' হাত বাড়িয়ে দিলাম, 'গুড বাই, অ্যান্ড গুড লাক! যত খুশি পাহাড়ী মেষ, হরিণ, বুনো শুয়োর, ফেয়্যান্ট আর পার্ট্রিজ মারুন; শুধু দয়া করে খেয়াল রাখবেন, মাখকো-ভাসনযি কলোনা বা তার পরিবারের কারও দিকে একটা গুলি ছুঁড়লে আপনার-আমার দুজনেরই সম্মান ধুলোয় লুটাবে।'

চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে গেল অখলান্দের। দুষ্টামি হাসি দিয়ে বলল, 'আপনি জানেন, চামড়াসর্বস্ব একটা মোরগ ফেরত দিয়েছে ব্যাটা আমাকে?' কথাটা বলেই একলাফে ঝোপঝাড়ের আড়ালে চলে গেল সে, এবং মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চলতে শুরু করে ভাবলাম, কে জানে, হয়তো এই কারণেই আবার একটা লড়াই বেধে যাবে অখলান্দ আর কলোনাদের মধ্যে। এছাড়া আর কাজ কোথায় ওদের?

সেই রাতটা ঘুমালাম আলবিত্রিসিয়ায়। পরদিন পৌঁছলাম আজাসিওতে।

আটদিন পর আমি প্যারিসে।

বারো

প্যারিসে পৌঁছে সেইদিনই মশিয়ে লুই দো ফ্রানশির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কিন্তু বাড়িতে পেলাম না।

আমার কার্ড আর সেই সঙ্গে ছোট্ট একটা চিরকুটে দু'চার কথা লিখে রেখে এলাম। লিখেছি: সরাসরি সুলাকাখো থেকে এসেছি আমি, তার ভাই মশিয়ে লুসিয়েনের লেখা একটা চিঠি আছে আমার কাছে। চিঠিটা হাতে-হাতে পৌঁছে দেব বলে কথা দিয়েছি তার মাকে। কখন এলে তাকে বাসায় পাওয়া যাবে যেন দয়া করে আমাকে জানায়।

পরদিন বেলা এগারোটার দিকে আমি যখন পোশাক পরছি, চাকর এসে খবর দিল মশিয়ে লুই দো ফ্রানশি দেখা করতে চান। ভদ্রলোককে ড্রইংরুমে বসিয়ে খবরের কাগজগুলো দিতে বললাম, আমি আসছি পাঁচমিনিটে।

মিনিট পাঁচেক পর ড্রইংরুমে ঢুকে দেখি 'দ্য প্রেস' পত্রিকায় আমার লেখা সিরিয়ালটা পড়ছে মশিয়ে লুই, সম্ভবত ভদ্রতার খাতিরেই। পায়ের আওয়াজ পেয়ে মাথা উঁচু করল। দুই ভাইয়ের চেহারার মিল দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম।

উঠে দাঁড়াল লুই, বলল, 'মশিয়ে, আপনার চিরকুট পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমার এতবড় সৌভাগ্য বিশ্বাসই হতে চাইছিল না। আপনার ছবির সঙ্গে মেলে কি না দেখার জন্যে চাকরটার কাছে কম করেও বিশবার আপনার চেহারার বর্ণনা শুনেছি। আজ সকালে আগ্রহ আর দমন করতে না পেরে চলে এলাম আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে, এবং বাড়ির খবর জানতে। হয়তো একটু বেশি সকাল সকাল চলে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম।'

'মোটেও না, আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন, এবং আমার সম্পর্কে আপনার জানা আছে একথা জানতে পেরে সত্যিই গৌরবান্বিত বোধ করছি। কিন্তু বলুন তো, আমি কি সত্যিই মশিয়ে লুইয়ের সঙ্গে কথা বলছি, না কি আপনি আসলে লুসিয়েন দো ফ্রানশি?'

হাসল যুবক। 'হ্যাঁ, চেহারায় আশ্চর্য মিল আছে আমাদের। সুলাকাখোতে থাকতে আমরা দুজন ছাড়া আর কারও পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না আমরা কে কোন্‌জন। তবে পোশাকে নিশ্চয়ই দুজনকে আলাদা ভাবে চেনা যায়? আমি চলে আসার পর নিশ্চয়ই ওর খাঁটি কর্সিকান আচার-আচরণ বদলে যায়নি?'

'না, তা যায়নি,' বললাম। 'তবে চলে আসার দিন তাঁকে ঠিক আপনার এই পোশাক পরা অবস্থায় দেখেছি বলে কেমন যেন ধাঁধা লেগে গেছিল। যাক,' লুসিয়েনের চিঠিটা বের করে এগিয়ে দিলাম, 'বাড়ির খবর জানার জন্যে নিশ্চয়ই আপনি উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন। গতকাল চিঠিটা রেখে আসতে পারতাম, যদি না মাদাম দো ফ্রানশিকে কথা দিতাম যে এটা নিজ হাতে আপনার কাছে পৌঁছব।'

'সবাইকে ভাল দেখে এসেছেন তো?' চিঠিটা হাতে নিয়ে জানতে চাইল মশিয়ে লুই।

'হ্যাঁ, তবে কিছুটা উদ্বিগ্ন।'

'আমার জন্যে?'

'হ্যাঁ। চিঠিটা পড়ুন।'

পড়তে শুরু করল সে।

চিঠিতে দ্রুত চোখ বুলাচ্ছে লুই, মাঝে মাঝেই হাসি হাসি হচ্ছে মুখ, বিড়বিড়

করে দু'একটা শব্দ উচ্চারণ করছে।

চিঠি শেষ হতেই বললাম, 'বাড়ির সবাই আপনার জন্যে চিন্তিত ছিলেন আসলে ভয়ের কোনও কারণ ছিল না দেখে আমি আনন্দিত।'

'ঠিক তা নয়,' আমতা-আমতা করে বলল লুই, 'অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, এটা সত্যি; তবে তার আসল কারণ আশাভঙ্গ, মোহভঙ্গও বলতে পারেন—কিংবা বলতে পারেন গভীর মনোকষ্ট। এটা আরও বেড়েছিল এই ভেবে যে বেচারা লুসিয়েন আমার সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট পাচ্ছে ওখানে।'

'হ্যাঁ, উনি আমাকে বলেছেন। তখন কথাটা আমি ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি, এখন আপনার কথায় প্রমাণ হয়ে গেল যে মশিয়ে লুসিয়েনের সেই কষ্ট কাল্পনিক কিছু ছিল না। আপনার তো কোনও সন্দেহ নেই যে আপনার মানসিক যাতনার ফলেই কষ্ট পাচ্ছিলেন আপনার ভাই?'

'কোনও সন্দেহ নেই তাতে।'

'এবার সত্যিই প্রবল আগ্রহ বোধ করছি ব্যাপারটায়। আপনার সেই মর্ম-বেদনা কি দূর হয়েছে?'

'খোদা! কি করে যাবে?' মৃদু কণ্ঠে বলল লুই। 'আপনি তো জানেন, মানুষের হৃদয় জখম হলে সারতে সময় লাগে। আচ্ছা, এবার আমাকে উঠতে হবে। আপনি যদি অনুমতি দেন, মাঝে মাঝে এসে সুলাকাখো সম্পর্কে গল্প করব আপনার সঙ্গে।'

'আনন্দের সঙ্গে,' জবাব দিলাম। 'কিন্তু এখনই নয় কেন? এতক্ষণে লাঞ্চ রেডি হয়ে গেছে। চারটে খেয়ে নিয়ে সুলাকাখোর গল্প করতে পারি আমরা।'

'আমি দুঃখিত, সেটা সম্ভব হচ্ছে না আজ। গতকাল চ্যান্সেলরের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি, আজ ঠিক বারোটায় বিচার মন্ত্রণালয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। সময় হয়ে এসেছে, একজন হবু-উকিলের কি উচিত হবে তাঁর মত অত বড় একজন মানুষকে অপেক্ষায় রাখা?'

'এই ডাকটা কি অখলান্দ আর কলোনার ব্যাপারে কথা বলার জন্যে?'

'খুব সম্ভব। আমার ভাই লিখেছে, ঝগড়াটা মিটমাট...'

'নোটারির সামনে,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম। 'চুক্তিপত্রে আমিও সই করেছি অখলান্দের জামিনদার হিসেবে।'

'হ্যাঁ। আমার ভাই লিখেছে সেকথা,' ঘড়ি বের করে দেখল সে, 'বেশি সময় নেই হাতে। যাই, চ্যান্সেলরকে বলি গে যাই, আমার ভাই আমার অনুরোধ রেখেছে।'

'অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে, এটুকু বলতে পারি।'

'আমি জানতাম। নিজ মতের বিরুদ্ধে হলেও ও যেভাবে পারে কাজটা করবেই।'

'হ্যাঁ। ওকে ধন্যবাদ দিতেই হবে। আমি জানি, খুবই কষ্ট হয়েছে ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে আপোস নিষ্পত্তির মধ্যস্থতা করতে।'

'এ নিয়ে পরে একসময় আলাপ করব আমরা; আপনার মাধ্যমে আমার দেশ, আমার মা, আমার ভাইয়ের ছোঁয়া পাচ্ছি আমি, মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি ওদেরকে—কী যে ভাল লাগছে! কবে, কোন্ সময়ে...'

'সেটা এখুনি বলা কঠিন। মাত্র দেশে ফিরেছি, এখন প্রথম কয়েকটা দিন কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটবে। আপনিই বরং বলুন কবে কোথায় আপনাকে পাওয়া যাবে।'

'আচ্ছা, মি-কাখিম উৎসব আগামী কাল, তাই না?'

'কাল?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে?'

'অপেরার "বল"-এ আপনি যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ এবং না। হ্যাঁ, যদি আপনি ওখানে আমাকে দেখা করতে বলেন; আর না, যদি যাওয়ার বিশেষ কোনও কারণ না সৃষ্টি হয়।'

'কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। কথা দিয়েছি...'

'বাহ্!' হাসিমুখে প্রশংসা করলাম, 'সময়ে গভীর ক্ষতও সেরে যায় বলেছিলেন, লক্ষণটা টের পাওয়া যাচ্ছে।'

হাসল না লুই। 'ব্যাপারটা যা ভাবছেন তা নয়। বোধহয় নতুন কোনও ঝামেলায় জড়াতে যাচ্ছি।'

'তাহলে না গেলেই হয়।'

'নিজ ইচ্ছেমত যদি চলা যেত দুনিয়ায়! স্রোতের টানে যেন ভেসে চলেছি, ভাগ্য যেদিকে নেয়। ভাল করেই জানি, না গেলেই ভাল হয়। কিন্তু যাব।'

'বেশ। তাহলে কাল, অপেরায়?'

'হ্যাঁ।'

'কখন?'

'এই ধরুন, রাত সাড়ে বারোটায়?'

'কোন্‌খানে?'

'ফয়ায়। ঠিক একটার সময় ঘড়ির নিচে দেখা করতে হবে আমার একজনের সঙ্গে।'

'ঠিক আছে, যাব তাহলে।'

হ্যান্ডশেক করেই তাড়াহুড়োর ভঙ্গিতে বেরিয়ে যেতে চায় লুই। হাতে আর সময় নেই। তবু এরই মধ্যে ওকে থামিয়ে লুসিয়েনের আলিঙ্গন উপহার দিলাম। খুশিমনে চলে গেল সে হাসতে হাসতে।

খুব ব্যস্ততায় কাটল আমার দিনটা, পরদিনও সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত টুকিটাকি অসংখ্য কাজ সারতে হলো—বহুদিন বাইরে থাকায় জমে গেছে অনেক কাজ। রাত ঠিক সাড়ে বারোটায় গিয়ে পৌঁছলাম অপেরায়। একটু দেরি করে এল লুই, বলল, চিনতে পেরেছে মনে করে এক মুখোশধারিণীর পিছুপিছু ঘুরেছে এতক্ষণ, কিন্তু মহিলা হারিয়ে গেছে লোকের ভিড়ে।

দু'একবার কথা শুরু করতে গিয়ে বুঝলাম কথাবার্তার মূডে নেই সে এখন, চোখজোড়া বার বার চলে যাচ্ছে ঘড়ির দিকে। হঠাৎ 'ওই যে আমার ভায়োলেট বাকেট' বলেই ছুট দিল একদিকে।

ঠেলাঠেলি করে ও যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম এক মুখোশপরা মহিলাকে। মস্ত এক ভায়োলেটের তোড়া হাতে তার।

নানান রকম ফুলের তোড়ার অভাব নেই ফয়ায়। ক্যামেলিয়ার তোড়া হাতে এক মহিলা জানাল প্যারিসে ফিরে আসা উপলক্ষে আমাকে অভিনন্দন জানাতে চায়। নাচলাম তার সঙ্গে। ক্যামেলিয়ার পর এল বুনো গোলাপ, তারপর হেলিওট্রোপের তোড়া। যেইমাত্র আমি পঞ্চম তোড়ার সঙ্গে নাচ শেষ করেছি, ঠিক তখনই দেখা হলো ডি—র সঙ্গে।

'আরে! ভালই হলো, দেখা হয়ে গেল তোমার সঙ্গে,' বলল সে, 'ঠিক সময় মত। তিনটের সময় সাপারে চলে এসো আমার বাসায়,' কারা কারা আসছে বলল সে, সবাইকেই চিনি, বন্ধু স্থানীয়। 'তোমার আশায় থাকব আমরা।'

'অনেক ধন্যবাদ,' বললাম আমি, 'তোমার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু দুঃখিত, পারছি না, আরেকজন আছে সঙ্গে।'

'এটা কোনও কথাই হলো না। আমাদের প্রত্যেকে একটা করে তোড়া নিয়ে

আসবে, ছয়টা পানির জগ রাখা হচ্ছে টেবিলে যাতে ফুলগুলো তাজা থাকে।'

'দোস্ত, ভুল বুঝছ। তোমার জগে রাখার মত কোনও ফুলের তোড়া নেই আমার। পুরুষ বন্ধু।'

'তাতেই বা অসুবিধে কিসের? তোমার বন্ধু হলে সে নিশ্চয়ই আমাদেরও বন্ধু?'

'না। অল্পবয়সী এক যুবক, তোমরা একে চেনো না।'

'বাহ্! চিনিয়ে দিলেই চিনে নেব।'

'ঠিক আছে, তোমার আমন্ত্রণের কথা আমি বলব তাকে।'

'হ্যাঁ। যদি আঁইগুঁই করে, জোর করে ধরে আনবে।'

'ঠিক আছে, আমার সাধ্যমত আমি চেষ্টা করব। ঠিক কখন শুরু করছ?'

'তিনটের সময়। তবে সাপার চলবে ভোর ছ'টা পর্যন্ত, যথেষ্ট সময় আছে, এর মধ্যে যখনই পারো চলে এসো।'

'বেশ।'

কথা শেষ হতেই অপেক্ষারতা এক মায়োসোটিসের তোড়া ডি—র বাহুলগ্না হয়ে তাকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

মিনিট কয়েক পর লুইকে দেখলাম ভায়োলেট তোড়াকে ছেড়ে হন-হন করে এদিকে আসছে। আমার সঙ্গের মহিলাকে এক বন্ধুর হাতে গছিয়ে দিয়ে লুইয়ের হাত ধরলাম। 'যে জন্যে এখানে এসেছেন, সে-কাজ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। খোদা! বল-মাস্কে মানুষ এমন সব কথা বলে!'

'কিছু মনে করবেন না,' বললাম আমি, 'আপনার ভাইকে চিনি বলে আপনাকেও আমার মনে হচ্ছে যেন কতদিনের চেনা··· আপনাকে বড় বিপর্যস্ত মনে হচ্ছে, ব্যাপার কি খুলে বলবেন আমাকে?'

চুপ করে রইল লুই। আমিও চাপাচাপি করলাম না। গোপন কথা গোপনই রাখতে চায় ও।

ঘরময় কয়েক পাক ঘুরলাম আমরা। আমি কাউকে আশা করছি না, তাই নির্বিকার; কিন্তু কোনও মহিলা কাছাকাছি এলেই খুঁটিয়ে দেখছে লুই, মুখোশ পরা ডোমিনোকে চেনার চেষ্টা করছে।

'এদিকে তাকান,' বললাম, 'এখন আপনার কি করা উচিত জানেন?'

চমকে উঠল ও, যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙেছে।

'আমি?···কই না!···কি বললেন যেন?'

'বললাম, একটু অন্য ধরনের কিছু করা উচিত এখন আপনার।'

'যেমন?'

'চলুন আমার এক বন্ধুর ওখানে সাপার খেতে যাই।'

'না, না; বিমর্ষ, দুঃখ-জর্জরিত এক অতিথি হয়ে সবার বিরক্তি···'

'কী যে বলেন, ওরা এমন মজার মজার কথা বলবে যে, দেখবেন আপনার মনটা ভাল হয়ে গেছে।'

'তাছাড়া, আমি আমন্ত্রিত নই।'

'ভুল বললেন; আপনি আমন্ত্রিত।'

'তাই নাকি? আপনার বন্ধুকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু সত্যি বলতে কি···মনটা টানছে না···'

ঠিক এই সময়ে আমাদের পাশ কাটাল ডি—। এখনও মায়োসোটিস তোড়ার খপ্পরেই আছে। হঠাৎ আমার ওপর চোখ পড়ল ওর।

'তাহলে, সেই কথাই থাকল, কি বলো?' বলল সে, 'ঠিক তিনটায়। তোমার বন্ধুকে নিয়ে আসছ।'

'দুঃখিত, দোস্ত; আমি আসতে পারছি না।'
'তাহলে মরো গে যাও!'
হাসতে হাসতে চলে গেল সে।
'লোকটা কে?' কথার কথা হিসেবে জানতে চাইল লুই।
'ওর নাম ডি—, অনেক দিনের বন্ধু; প্রাণোচ্ছল মানুষ। প্যারিসের একটা নামকরা দৈনিক পত্রিকার ম্যানেজার।'
'বলেন কি! মশিয়ে ডি—!' যেন আঁৎকে উঠল লুই, 'মশিয়ে ডি—! তাঁকে চেনেন আপনি?'
'খুব ভাল করেই চিনি। কেন?'
'ওঁর বাড়িতেই দাওয়াত আপনার?'
'ঠিক ধরেছেন।'
'ওঁর ওখানেই আমাকে নিয়ে যেতে চাইছিলেন?'
'হ্যাঁ।'
'তাহলে রাজি আমি। নিশ্চয়ই যাব আপনার সঙ্গে।'
'বেশ। তবে আমাকে খুশি করার জন্যে রাজি হচ্ছেন না তো?'
'না,' মাথা নাড়ল লুই। বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ওকে। 'না গেলেই বোধহয় ভাল করতাম। কিন্তু নিয়তির টান এড়াব কি করে? নিজের ইচ্ছেয় কি চলছি আমরা? আসলে তো সবাই আমরা বিধাতার হাতের পুতুল। পরিষ্কার বুঝতে পারছি এখন, আজ এখানে না এলেই বুদ্ধিমানের কাজ করতাম।'
ঠিক এই সময় আবার দেখা হলো ডি—র সঙ্গে।
'শোনো, দোস্ত,' বললাম, 'মত পাল্টেছি আমি।'
'আসছ তাহলে আজ?'
'হ্যাঁ।'
'বাহ্! চমৎকার! তবে একটা ব্যাপারে তোমাকে হুঁশিয়ার করা দরকার।'
'কি সেটা?'
'আজ আমাদের সঙ্গে যারা সাপার খাবে, আগামী পরশুও তাদেরকে সাপার খেতে হবে আমাদের সঙ্গে।'
'কেন?'
'কারণ শাতো-রোনোর সঙ্গে বাজি ধরেছি।'
অনুভব করলাম, আমার বাহুতে চেপে বসল লুই-র আঙুলগুলো। পাশ ফিরে তাকালাম। মুখটা একটু ফ্যাকাসে লাগছে, এছাড়া আর কোনও ভাবের প্রকাশ নেই।
'কি নিয়ে বাজি?' জিজ্ঞেস করলাম ডি—কে।
'লম্বা কাহিনী, এখানে বলা যাবে না। তাছাড়া যাকে নিয়ে এই বাজি, সেই মহিলা শুনে ফেললে হারবে শাতো-রোনো।'
'ঠিক হ্যায়, তাহলে তিনটেয়।'
হাঁটছি। ঘড়িতে দেখলাম, রাত দুটো পঁয়ত্রিশ বাজে।
'এই মশিয়ে দো শাতো-রোনোকে চেনেন নাকি?' প্রশ্ন করল লুই, প্রাণপণ চেষ্টা করছে ভাবাবেগ চেপে রাখতে।
'চেহারাটা চিনি, এক-আধবার দেখেছি পার্টিতে।'
'তাহলে আপনার বন্ধু নয় লোকটা?'
'না। পরিচিতও নয়।'
'তাহলে বাঁচা গেল!' যেন হাঁপ ছাড়ল লুই।
'কেন?'

'না, এমনি বললাম কথাটা।'

'আপনি চেনেন বুঝি ওকে?'

'ওই, একরকম।'

এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে ও, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল মশিয়ে দো ফ্রানশি আর মশিয়ে দো শাতো-রোনোর মধ্যে একজন মহিলাকে নিয়ে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। আমার মন বলছে, এখন সবচেয়ে ভাল হয় যদি আমরা যে-যার বাসায় ফিরে যাই।

'মশিয়ে দো ফ্রানশি,' বললাম, 'আমার একটা কথা শুনবেন?'

'বলুন, কি কথা?'

'ডি—র বাড়িতে সাপারে আজ আর যাওয়ার দরকার নেই।'

'কি কারণে? উনি আশা করবেন আমাদের। তাছাড়া আপনিও তো কথা দিয়েছেন একজন বন্ধুকে নিয়ে যাবেন।'

'হ্যাঁ, কথা দিয়েছি।'

'তাহলে?'

'আমার মন বলছে, অমঙ্গল হতে পারে, ওখানে যাওয়া আজ আমাদের ঠিক হবে না।'

'কিন্তু নিশ্চয়ই মন পরিবর্তন করার পেছনে কোনও যুক্তি আপনার আছে? এই একটু আগেই তো আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রায় জোর করে নিয়ে যেতে চাইছিলেন ওখানে।'

'ওখানে গেলে মশিয়ে শাতো-রোনোর সঙ্গে দেখা হবে।'

'তাতে কি? শুনেছি চমৎকার মানুষ তিনি, আর একটু ভাল ভাবে জানতে পারব তাঁকে।'

'বেশ, তাহলে তাই হোক,' বললাম। 'মনে রাখবেন, শুধু আপনি যেতে চাইছেন বলেই আমি যাব।'

নিচে নেমে কোট পরে নিলাম। অপেরার কাছাকাছিই থাকে ডি—। রাতটা চমৎকার, মুক্ত বাতাসে লুইয়ের উপকার হবে মনে করে বললাম, হেঁটেই যাই। রাজি হলো ও।

তেরো

ড্রইংরুম আলো করে বসে আছে ওরা, সবাই আমার পরিচিত, বন্ধুবান্ধব। দো বি—, এল—, ভি—, এ—। সবাই ওরা যার যার ক্ষেত্রে স্বনামধন্য। ওদের সঙ্গে দু'তিনজন মুখোশখোলা ডোমিনোও রয়েছে, হাতের তোড়াগুলো রাখছে পানি ভরা জগে।

সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম লুই দো ফ্রানশিকে। বলা বাহুল্য, আন্তরিকতার সাথেই স্বাগত জানাল ওরা ওকে।

দশ মিনিট পর মায়োসোটিস বাকেটকে নিয়ে ঢুকল ডি—। সুন্দরী মহিলা, মুখোশ খোলার সহজ ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল, এ-ধরনের পার্টিতে যোগদানে অভ্যস্ত।

ডি—র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম মশিয়ে দো ফ্রানশির।

'এইবার,' চেঁচিয়ে বলল দো বি—, 'সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে যখন, আমার মনে হয়, খাওয়া-দাওয়া শুরু করা যেতে পারে।'

'পরিচয় পর্ব শেষ হয়েছে বটে,' বলল ডি—, 'কিন্তু সবাই এসে পৌঁছেনি এখনও।'

'বাকি থাকল কে আবার?'

'শাতো-রোনো।'

'ও-হ্যাঁ, কি একটা বাজির ব্যাপার আছে শুনলাম?' জিজ্ঞেস করল ভি—।

'হ্যাঁ। আমাদের বারোজনকে সাপার খাওয়াবে সে, যদি এক বিশেষ মহিলাকে সঙ্গে করে আনতে না পারে।'

'সেই বিশেষ মহিলাটি কে,' জানতে চাইল মায়োসোটিস তোড়া, 'যার জন্যে একেবারে বাজি ধরাধরি?'

দো ফ্রানশির দিকে চেয়ে দেখলাম, বাইরে থেকে যদিও শান্ত দেখাচ্ছে, মরার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর চেহারা।

'আমার ধারণা,' বলল ডি—, 'নামটা বলা যেতে পারে, বিশেষ করে কেউ তোমরা আগে এ-নাম শোনোনি যখন। ইনি হচ্ছেন মাদাম…'

ডি—র বাহুতে একটা হাত রাখল লুই। 'মশিয়ে,' আবেদন ফুটে উঠল ওর কণ্ঠে, 'আমাদের নতুন পরিচয়ের সম্মানে আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?'

'বলুন, মশিয়ে?'

'মশিয়ে শাতো-রোনোর সঙ্গে যাঁর আসার কথা, দয়া করে সে মহিলার নামটা উচ্চারণ করবেন না। আপনি জানেন, উনি বিবাহিতা।'

'তা ঠিক, কিন্তু তার স্বামী তো স্মার্না, ভারত, মেক্সিকো না আর কোথায় জানি রয়েছে। কোনও মহিলার স্বামী যদি এত দূরে থাকে, ধরে নিতে হয় যে স্বামী নেই।'

'তাঁর স্বামী অল্প কয়েকদিনেই ফিরছেন, আমি চিনি তাঁকে; সৎ ও সাহসী যোদ্ধা একজন। স্ত্রীর নির্বুদ্ধিতায় ফিরে এসে তিনি যে প্রচণ্ড আঘাত পাবেন, অপমানিত বোধ করবেন, তা থেকে তাঁকে রেহাই দেয়া হয়তো সম্ভব, যদি নামটা উচ্চারণ না করেন।'

'তাহলে, মশিয়ে, আমাকে ক্ষমা করুন,' বলল ডি—। 'আমি বোধহয় ভুলই করতে যাচ্ছিলাম। আমি জানতাম না আপনি মহিলাকে চেনেন, বিবাহিতা কি না সে ব্যাপারেও পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম না। যাই হোক, আপনি যখন তাঁকে ও তাঁর স্বামীকে চেনেন…'

'হ্যাঁ, দুজনকেই চিনি।'

'সেক্ষেত্রে সত্যিই সংযত হতে হবে আমাদের। ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, শাতো-রোনো আসুক বা না আসুক, একা আসুক বা সঙ্গে কেউ থাকুক, বাজিতে জিতুক বা হারুক, আপনাদের অনুরোধ করছি, বাইরের কারও কানে যেন একটি কথাও না যায়।'

সবাই শপথ করল গোপনীয়তা রক্ষা করবে; সম্ভবত নারীর সম্মান রক্ষার্থে নয়, পেটের জ্বালায়; কারণ খিদেয় পেট জ্বলছে সবার, খাবার টেবিলে গিয়ে বসার জন্যে উসখুস করছে।

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মশিয়ে,' দো ফ্রানশি বলল ডি—কে, হ্যান্ডশেক করল তার সঙ্গে, 'আপনি সত্যিকার একজন নিখুঁত ভদ্রলোকের কাজ করলেন।'

সবাই ডাইনিং রুমে গিয়ে বসলাম। দুটো সীট খালি থাকল শাতো-রোনো আর তার সঙ্গে যে মহিলা আসবার কথা, তার জন্যে। চেয়ার দুটো সরিয়ে ফেলতে যাচ্ছিল একজন ভৃত্য, বারণ করল গৃহস্বামী, 'না। ওগুলো থাক। চারটে পর্যন্ত সময় দেয়া আছে শাতো-রোনোকে। চারটে বাজলে হেরে যাবে ও বাজিতে, তখন সরিয়ে নিয়ো।'

দেখলাম বারবার ঘড়ির দিকে চাইছে মশিয়ে দো ফ্রানশি। ঘড়িতে এখন চারটা বাজতে বিশ।

'আপনার ঘড়ির সময় ঠিক আছে তো?' নরম গলায় জানতে চাইল লুই।

'ওর ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে সেট করেছি এই দেয়াল ঘড়ির সময়, যাতে পরে গলাবাজি না করতে পারে!' হাসল ডি—। 'ওর ঘড়িতেও এখন এই একই সময় বাজছে।'

'আহা,' বলল মায়োসোটিস তোড়া, 'শাতো-রোনো আর তার অজানা সেই রহস্যময়ী মহিলা সম্পর্কে যখন আমাদের চুপ করেই থাকতে হবে, তখন মনে হয় এসব আলাপ বাদ দিয়ে আমাদের প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা উচিত।'

'ঠিক বলেছ ই—,' বলল ভি—, 'আরও কত মহিলা আছে এই দুনিয়ায়। তাদের নিয়ে মেতে ওঠা যাক।'

'তাদের সবার স্বাস্থ্যপান দিয়ে শুরু করা যেতে পারে,' বলল ডি—।

যে-যার পাশে রাখা ঠাণ্ডা শ্যাম্পেনের বোতল থেকে গ্লাস ভর্তি করায় মন দিল।

আমি লক্ষ করলাম, ঢালল বটে, কিন্তু ঠোঁটে শ্যাম্পেন ছোঁয়াচ্ছে না লুই।

'পান করুন,' বললাম আমি তাকে, 'দেখতেই পাচ্ছেন, ও আজ আসবে না।'

'এখনও পনেরো মিনিট সময় আছে,' বলল লুই। 'চারটে বেজে গেলে দেখবেন কারও চেয়ে পিছিয়ে পড়ে নেই আমি।'

'বেশ তো।'

নিচু গলায় এসব কথা চলছে আমাদের মধ্যে। লক্ষ করলাম সবারই গলা চড়ছে একটু একটু করে। লুই আর ডি—বারবার তাকাচ্ছে ঘড়ির দিকে। চারটে বাজতে যখন পাঁচ মিনিট বাকি, তখন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলাম আমি লুইয়ের দিকে।

'আপনার স্বাস্থ্য!' বললাম আমি।

মৃদু হেসে নিজের গ্লাস ঠোঁটে তুলল সে।

গ্লাসটা অর্ধেক শেষ হয়েছে, এমনি সময় জোরে বেজে উঠল ঘণ্টা। মুহূর্তে সমস্ত রক্ত সরে গেল ওর মুখ থেকে। ফিসফিস করে বলল, 'এই এলো!'

'হয়তো। তবে হয়তো ভদ্রমহিলাটি তার সঙ্গে নেই,' বললাম।

'আসুক, দেখা যাবে।'

সবাই চুপ হয়ে গেছে। দরজার কাছে তর্ক-বিতর্কের শব্দ পাওয়া গেল। উঠে গিয়ে ডাইনিং রুমের দরজা খুলে দিল ডি—।

'লোকটার গলার আওয়াজ চিনতে পারছি আমি!' কথাটা বলে আমার কব্জি চেপে ধরল লুই শক্ত করে।

'শান্ত হন, অস্থির হবেন না,' বললাম আমি। 'মহিলা যদি অপরিচিত কারও বাসায় অপরিচিত লোকেদের সঙ্গে সাপার খেতে আসেন, বুঝতে হবে তিনি বাজে মেয়েছেলে, আর এরকম রাস্তার মেয়েছেলে কোনও সৎ লোকের প্রিয়-পাত্রী হতে পারে না। আমার ধারণা, ওঁকে ফুসলে আনার চেষ্টা হচ্ছে।'

'আসুন, মাদাম, ভেতরে চলে আসুন,' বলছে ডি—, 'দয়া করে ভেতরে আসুন, এখানে আমরা কজন বন্ধু আছি শুধু, আপনার খারাপ লাগবে না।'

'চলে এসো, এমিলি,' বলল মশিয়ে দো শাতো-রোনো। 'নাহয় মুখোশ তুমি খুলো না।'

'বদমাইশ! বদমাইশ কোথাকার!' বিড়বিড় করে বলল লুই দো ফ্রানশি।

এমনি সময় প্রায় টেনে-হিঁচড়ে এক মহিলাকে ঘরের ভেতর নিয়ে এল শাতো-রোনো, পাশে থেকে অবিরাম সাধাসাধি করছে ডি—।

'চারটে বাজতে এখনও তিন মিনিট বাকি,' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ডি—র দিকে চেয়ে

শান্তকণ্ঠে ঘোষণা করল শাতো-রোনো।

'ঠিক, দোস্ত, তুমিই জিতলে।'

'এখনও জেতেনি, মশিয়ে,' বলল অচেনা মহিলা। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে শাতো-রোনোর চোখে চোখ রাখল। 'এখন বুঝতে পারছি আপনি এত জোরাজুরি কেন করছিলেন···বাজি ধরেছেন, এই অপরিচিত বাড়িতে আমাকে সাপারে নিয়ে আসবেন—তাই না?'

শাতো-রোনো কোনও জবাব দিচ্ছে না দেখে ডি—র দিকে ফিরল সে।

'এই ভদ্রলোক যখন উত্তর দিচ্ছেন না, আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, মশিয়ে, মশিয়ে দো শাতো-রোনো কি আপনার সঙ্গে বাজি ধরে আমাকে এখানে টেনে এনেছেন?'

'মিথ্যে বলা উচিত হবে না, মাদাম, হ্যাঁ, এই রকমই একটা কথা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে।'

'বুঝলাম। কিন্তু যেহেতু আমি ভেবেছিলাম আমার কোনও বন্ধুর বাসায় সাপার খেতে চলেছি, জানতাম না কোথায় নিয়ে চলেছেন উনি আমাকে; বাজিতে ওঁরই হার হয়েছে। এখানে অপরিচিত একজনের বাসায় আমি স্বেচ্ছায় আসিনি। মশিয়ে দো শাতো-রোনো বাজিতে জিততে গিয়ে আমাকে অসম্মান করতে দ্বিধা করেননি। কাজেই আমি···'

'প্লীজ, এমিলি, এসেই তো পড়েছ,' বলল মশিয়ে দো শাতো-রোনো, 'থাকো না। চেয়ে দেখো, সবাই এঁরা ভদ্রলোক, সবাই ওঁরা ভদ্রমহিলা।'

'আমাকে টেনে আনা হয়েছে,' শাতো-রোনোর কথা কানেই তুলল না অচেনা মহিলা, ডি—র দিকে ফিরে বলল। 'মনে হচ্ছে আপনিই গৃহকর্তা, আপনার সহৃদয় সৌজন্যে আমি মুগ্ধ, আপনাকে ধন্যবাদ; যদিও আপনার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারছি না। এক্ষুণি আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই, মশিয়ে লুই দো ফ্রানশি যদি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেন, আমি কৃতজ্ঞ থাকব তাঁর কাছে।'

এক লাফে উঠে পড়ল লুই, ছুটে গিয়ে দাঁড়াল অচেনা মহিলা আর মশিয়ে দো শাতো-রোনোর মাঝখানে।

রাগে কাঁপতে শুরু করল শাতো-রোনো, নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে; চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এমিলি, আমার সঙ্গে এসেছ এখানে, যেতে যদি হয় আমিই নিয়ে যাব তোমাকে।'

আমাদের দিকে ফিরল অচেনা মহিলা। 'মেসিয়া, আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোক আছেন এখানে। আমি আমার সম্মান আপনাদের হাতে ন্যস্ত করছি। আমার অনুরোধ, মশিয়ে দো শাতো-রোনো আমাকে অপমান করবার চেষ্টা করলে আপনারা তাঁকে ঠেকাবেন।'

শাতো-রোনো এগোতে গেল, আমরা সবাই একসাথে উঠে দাঁড়ালাম।

পরিস্থিতি যে সুবিধের নয়, বুঝতে পারল শাতো-রোনো। বলল, 'ঠিক আছে, মাদাম, তুমি যেতে পারো। আমি জানি কার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে আমাকে।'

'মশিয়ে যদি আমাকে বুঝিয়ে থাকেন,' মাথা উঁচু করে মর্যাদার সঙ্গে বলল লুই দো ফ্রানশি, 'আজ সারাদিন পাবেন আমাকে ৭ নম্বর রু দো হোলদোখ-এ।'

'বেশ। ঠিক আছে, মশিয়ে। তবে আপনার বাসায় আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হবে না; আমার বদলে আমার দুই বন্ধু যাবেন, তৈরি থাকবেন।'

'জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছেন, মশিয়ে,' বলল লুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে, 'একজন ভদ্রমহিলার সামনে এসব হুমকি···ছি, ছি! চলুন, মাদাম,' মহিলার বাহু ধরল সে, 'বিশ্বাস করুন, আমাকে আজ আপনি যে সম্মান দিলেন, তার জন্যে অন্তরের

অন্তস্তল থেকে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

বেরিয়ে গেল দুজন। কবরের স্তব্ধতা নেমে এল ঘরে।

'যাক, মেসিয়া, যা হবার হলো,' সবার আগে সামলে নিল শাতো-রোনো। 'আমি হেরে গেছি। আগামী পরশু আমরা সবাই সাপার খাব ফেখ-রোভেনস-এ।'

কথাটা বলে খালি চেয়ার দুটোর একটায় বসল সে, একটা গ্লাস তুলে বাড়িয়ে ধরল ডি—র দিকে, কানায় কানায় ভরে যেতে চুমুক দিল তাতে।

কথায় কথায় বারবার উচ্চ, কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠল মশিয়ে দো শাতো-রোনো, কিন্তু পার্টি আর জমল না।

চোদ্দ

সেইদিনই সকাল দশটায় গিয়ে দাঁড়ালাম লুই দো ফ্রানশির দরজায়। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় দুজন লোককে নামতে দেখলাম। একজনকে দেখে বোঝা গেল কেতাদুরস্ত শহুরে লোক; অপরজন সিভিলিয়ান পোশাক পরা থাকলেও বুঝতে অসুবিধে হলো না, সৈনিক—বুকে পদক আঁটা। বুঝলাম মশিয়ে লুই দো ফ্রানশির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এরা। বেল বাজালাম।

চাকর এসে জানাল গৃহস্বামী তাঁর পড়ার ঘরে। একটা চিঠি লিখছিল লুই, আমি এসেছি শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল।

'বাহ্, এসে পড়েছেন,' বলে অসমাপ্ত চিঠিটা দলা পাকিয়ে চুলোয় ফেলল সে। 'আপনাকেই লিখছিলাম। ঠিক আছে, জোসেফ, তোমাকে আর বাইরে যেতে হবে না। কেউ এলে বলবে আমি বাড়ি নেই। ঠিক আছে?'

মাথা ঝুঁকিয়ে চলে গেল জোসেফ।

বসার জন্যে একটা চেয়ার দেখাল সে আমাকে। জিজ্ঞেস করল, 'দুজন লোককে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, একজন একটা পদক ঝুলিয়েছিল। ওদের কি মশিয়ে দো শাতো-রোনো পাঠিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, ওরা তাঁর সেকেন্ড।'

'আয়-হায়! ব্যাপারটাকে সত্যিই লোকটা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে দেখছি!'

'এছাড়া তাঁর তো কোনও উপায়ও ছিল না আর,' বলল লুই দো ফ্রানশি।

'ওরা কি এসেছিল...'

'আমার দুজন বন্ধুকে ওদের সঙ্গে আলোচনার জন্যে পাঠাতে বলে গেল। তখনই আপনার কথা মনে হলো।'

'সম্মানিত বোধ করছি। কিন্তু আরেকজন?'

'আমার এক বন্ধু, বাখন জিয়োখদানো মাখতেল্লিকে, লাঞ্চে দাওয়াত করেছি। এগারোটায় আসবে ও। আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করব, তারপর দুপুরের দিকে যদি আপনারা ওদের ওখান থেকে একটু ঘুরে আসেন... তিনটে পর্যন্ত থাকবে বলেছে বাসায়। এই যে নাম-ঠিকানা লেখা ওদের কার্ড।'

দুটো কার্ড বের করে দিল সে আমার হাতে। একজনের নাম ভাসকাঁ রনে দো শাতো-গ্রঁ, অপরজন মশিয়ে আদ্রিয়েন দো বোয়াসি। প্রথমজন থাকে ১২ নম্বর রু দো লা পেই-তে, আর দ্বিতীয়জন আর্মির লেফটেন্যান্টই হবে, থাকে ২৯ নম্বর রু দো

লিলি-তে।

কার্ড দুটো বারবার উল্টাচ্ছি-পাল্টাচ্ছি।

'কি নিয়ে এত চিন্তা করছেন?' জিজ্ঞেস করল লুই।

'এ-ব্যাপারে আপনি কতটা সিরিয়াস জানা দরকার। আমরা সেই ভাবেই কথাবার্তা চালাব।'

'কি বলছেন আপনি! কতটা সিরিয়াস মানে? রীতিমত সিরিয়াস। আপনি নিজের কানে শুনেছেন, মশিয়ে দো শাতো-রোনোকে নিজেই আমি ঠিকানা দিয়েছি, তিনি তাঁর সেকেন্ডদের পাঠিয়েছেন আমার কাছে। এটা এখন আর আমার হাতে নেই।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক...তবে...'

'বলে যান,' মৃদু হাসি লুইয়ের মুখে।

'সেক্ষেত্রে আমাদের জানতে হবে দ্বন্দ্বটা কি নিয়ে। ঝগড়ার কারণ না জেনে আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে পারি না দুজন লোক একে অপরের গলা কাটছে। সেকেন্ডদের দায়-দায়িত্ব দ্বন্দ্ব-যোদ্ধাদের চেয়ে বেশি, জানেন নিশ্চয়ই।'

'বেশ, সংক্ষেপে বলছি আমাদের ঝগড়ার কারণ:

'প্যারিসে আসার পর আমার এক বন্ধু, এক ফ্রিগেডের ক্যাপ্টেন, আমাকে তার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। অল্পবয়সী, অসম্ভব সুন্দরী এই মহিলা গভীর ছাপ ফেলল আমার মনে। পাছে তার প্রেমে পড়ে যাই, সেই ভয়ে বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ পেলে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতাম।

'এতে অসন্তুষ্ট হত আমার বন্ধু, প্রায়ই অনুযোগ করত। শেষে একদিন তাকে সত্যি কথাটা বললাম। বললাম কিসের ভয়ে আমি ঘন ঘন তার বাসায় যাই না। হাসল, আমার সঙ্গে হাত মেলাল, এবং সেই দিনই জোর-জুলুম করে আমাকে তার বাসায় ধরে নিয়ে গেল।

'খাওয়া-দাওয়ার পর আমাকে বলল, "লুই, আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে মেক্সিকো রওনা হচ্ছি আমি। তিনমাস বা তারও বেশি সময় থাকতে হবে দেশের বাইরে। আমরা, নৌ-বাহিনীর লোকেরা জানতে পারি কবে রওনা হতে হবে, কিন্তু কবে ফিরতে পারব সেটা আমাদের জানানো হয় না। আমার অনুপস্থিতির সময়টুকু এমিলিকে আমি তোমার দায়িত্বে রেখে যেতে চাই। এমিলি, লুই দো ফ্রানশিকে আপন ভাই বলে জানবে।"

'উত্তরে আমার হাত ঝাঁকিয়ে দিল ওর স্ত্রী।

'হঠাৎ এরকম একটা প্রস্তাব শুনে বোকা হয়ে গিয়েছিলাম, কোনও উত্তর দিতে পারিনি। ভবিষ্যৎ-বোনের কাছে নিশ্চয়ই একটা বুদ্ধু মনে হয়েছে আমাকে।

'তিন সপ্তাহ পর সত্যিই আমার বন্ধু চলে গেল।

'ওই তিন সপ্তাহে অন্তত সপ্তাহে একদিন সে আমাকে জোর করে নিয়ে গেছে বাসায়, না খেয়ে আসতে দেয়নি।

'মায়ের কাছে থাকল এমিলি। যাওয়ার আগে তার স্বামী জোর দিয়ে বলে গেছে, যেন মাঝে মাঝেই আগের মত বন্ধু-বান্ধব ডেকে খাওয়ানো হয়। কোনও অঘটন সে কল্পনাও করেনি, এমিলির ওপর তার এতই গভীর বিশ্বাস ছিল।

'কাজেই স্বামীর কথা মত মাঝেমাঝেই বন্ধু-বান্ধবদের দাওয়াত করতে থাকল এমিলি। অল্প কয়েকজনের পার্টি, তাছাড়া তার মা উপস্থিত—কাজেই কোনও রকম দুর্নাম হওয়ার উপায় নেই। বেশ চলছিল।

'মাস তিনেক আগে মঞ্চে প্রবেশ করল মশিয়ে দো শাতো-রোনো।

'মন যে আগাম সতর্ক সংকেত দেয়, এ আপনি বিশ্বাস করেন? ওঁকে দেখেই মনটা বিরূপ হয়ে গেল আমার, কেমন একটা অস্বস্তিবোধ পেয়ে বসল। ড্রইং-রুমের

আচার-আচরণে অত্যন্ত, অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও চালু এক লোকের পালিশ দেয়া ব্যবহার তাঁর, কোথাও কোনও খুঁত নেই; অথচ, যদিও উনি আমার সঙ্গে ভাল-মন্দ একটি কথাও কখনও বলেননি, উনি বেরিয়ে গেলে ঘৃণায় ছেয়ে যেত আমার অন্তর।

'কেন যে এমন হত বলতে পারব না।

'এমিলিকে প্রথম দেখে আমার যেমন লেগেছিল, কি করে যেন বুঝে ফেলেছি, এই ভদ্রলোকেরও ওই একই অবস্থা।

'তাছাড়া আমার মনে হলো তাঁকে আপ্যায়ন করতে গিয়ে খুবই চটুল ও চপল আচরণ করছে এমিলি। সন্দেহ নেই, এসব আমার দেখার ভুল; কিন্তু আপনার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ওকে অন্তর দিয়ে ভালবেসেছি আমি, তাই প্রচণ্ড ঈর্ষায় ভুগছিলাম।

'পরবর্তী এক সন্ধ্যায় মশিয়ে দো শাতো-রোনোর ওপর চোখ রাখলাম আমি। সেটা তাঁরও দৃষ্টি এড়াল না। নিচু গলায় এমিলিকে কিসব বললেন, আমার মনে হলো আমাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করছেন।

'আপনাকে কী বলব, ওই সন্ধ্যাতেই কোনও ছুতোয় ওঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে ডুয়েল লড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম আমি মনে মনে; কিন্তু সামলে নিলাম, বারবার নিজেকে বোঝালাম, এরকম কিছু একটা করে বসা উদ্ভট এক নির্বোধের কাজ হবে।

'ফলাফল? পরবর্তী প্রতিটা শুক্রবার ক্ষত-বিক্ষত হলাম আমি।

'মশিয়ে দো শাতো-রোনো দশ ঘাটের পানি খাওয়া চতুর লোক; টিপটপ ফুলবাবুই শুধু নয়, খ্যাতিমানও; আমি জানি আমার চেয়ে অনেক ওপরতলার মানুষ উনি, তাঁর সঙ্গে আমার কোনও তুলনাই হয় না; তবু আমার মনে হত যতটা উচিত তার চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা দিচ্ছে তাঁকে এমিলি।

'কিছুদিন পর জানতে পারলাম, মশিয়ে শাতো-রোনোর সঙ্গে এমিলির এই যে বাড়াবাড়ি রকমের ঘনিষ্ঠতা এটা অন্যদের চোখেও ধরা পড়েছে। আমার মত আর একজন নিয়মিত অতিথি জিয়োখদানো একদিন কথাটা তুলল আমার কাছে। তখনই মনস্থির করে ফেললাম, সরাসরি কথা বলব এমিলির সঙ্গে। আমার ধারণা ছিল না-বুঝে করছে ও কাজটা, বুঝিয়ে বললে দুর্নাম হওয়ার আগেই সামলে নেবে।

'কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম, প্রথমে ঠাট্টা হিসেবে উড়িয়ে দিল ও আমার কথাগুলো, তারপর বলল এসব আজগুবি ভাবনা; আমি আর জিয়োখদানো দুজনেই উদ্ভট চরিত্রের লোক।

'আমি আমার বক্তব্য থেকে নড়লাম না।

'তখন এমিলি জানিয়ে দিল, আমার সঙ্গে সে একমত হতে পারছে না, কারণ প্রেমে পড়লে মানুষের বিচার-বুদ্ধি একপেশে হয়ে যায়।

'তাজ্জব হয়ে গেলাম, আমার সব কথা বলেছে ওকে ওর স্বামী!

'সেই মুহূর্ত থেকে, বুঝতেই পারছেন, আমি হয়ে গেলাম প্রেমে ব্যর্থ এক ঈর্ষাকাতর যুবক, যার উদ্ভট আচরণকে করুণার দৃষ্টিতে দেখা যায়। এমিলির বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম।

'বন্ধ করলাম বটে, কিন্তু সব কথাই কানে আসতে থাকল, মশিয়ে দো শাতো-রোনোর সঙ্গে এমিলির মেলামেশা লোকের মুখরোচক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল খুব অল্পদিনেই।

'দীর্ঘ এক চিঠি লিখলাম। সেই চিঠিতে তার নিজ সম্মান, তার প্রবাসী স্বামীর সম্মান ইত্যাদির দোহাই দিয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করলাম। কাজ হলো না। জবাবই দিল না ও।

'বুঝলাম, আর কিছুই করার নেই আমার। প্রেমে পড়েছে বেচারী, কাজেই

আমারই মত অসহায়, অন্ধ—কেউ চোখে আঙুল দিয়ে কিছু দেখাতে চাইলেও দেখবে না এখন।

'এর কিছুদিন পর লোকে খোলাখুলি বলতে শুরু করল, ও এখন মশিয়ে দো শাতো-রোনোর রক্ষিতা।

'কী যে কষ্ট পেয়েছি! কেউ টের পায়নি, শুধু আমার বেচারী ভাইটি ছাড়া। আমার জন্যে কষ্ট পেতে হয়েছে ওকেও।

'এর সপ্তাহ দুয়েক পরেই আপনি এলেন।

'আপনি যেদিন এ-বাসায় প্রথম এলেন, ওই দিনই একটা বেনামী চিঠি পেলাম। এক অপরিচিতা মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান অপেরা বল-এ। আমার এক বন্ধুর স্ত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য জানাবেন।

'গতরাতে সেজন্যেই গিয়েছিলাম। বরং বলা ভাল, না গিয়ে পারিনি। যাই হোক, ভায়োলেট ফুলের তোড়া হাতে মহিলাকে সময় মতই পাওয়া গেল ঘড়ির নিচে। মহিলা আমাকে জানালেন, আমি অবশ্য আগেই জানি সেটা, মশিয়ে দো শাতো-রোনো হচ্ছেন এমিলির প্রেমিক। আমি প্রমাণ চাওয়ায় তিনি বললেন: মশিয়ে দো শাতো-রোনো মশিয়ে ডি—র সঙ্গে বাজি ধরেছেন যে তাঁর নতুন প্রণয়িনীকে ডি—র বাসায় সাপারে নিয়ে যেতে পারবেন।

'নিয়তির লিখন দেখুন কেমন: আপনি মশিয়ে ডি—র পরিচিত, আপনাকে তিনি সাপারে দাওয়াত করলেন, বললেন, আপনি ইচ্ছে করলে একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিতে পারবেন, আপনি আমাকে নিতে চাইলেন, আমি রাজি হলাম।

'এরপর থেকে সবই আপনার জানা।

'যা-যা ঘটেছে, এবং সেই প্রেক্ষিতে আমি যা-যা করেছি, এবং তার ফলে এখন যা-যা ঘটতে চলেছে—বলুন, এসব আমার এড়িয়ে যাওয়ার কোনও উপায় ছিল?'

কোনও উত্তর দিতে পারলাম না।

'কিন্তু,' হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর কথা মনে পড়ে গেল আমার, 'আমার যতদূর মনে পড়ে, আপনার ভাই আমাকে বলেছিলেন, আপনি জীবনে কখনও পিস্তল-বন্দুক বা তলোয়ার স্পর্শ করেননি।'

'সত্যি কথাই বলেছে।'

'তাহলে?' বুকের ভেতর ধড়ফড় করছে আমার। 'তাহলে প্রতিপক্ষকে ঠেকাবেন কি করে?'

'চিন্তা করবেন না, খোদার যা ইচ্ছে তাই হবে।'

পনেরো

এমনি সময়ে ভৃত্য জানাল বাখন জিয়োখদানো মাখতেল্লি এসেছেন।

লুই দো ফ্রানশির মত ইনিও কর্সিকান, সাখতান প্রদেশের লোক। আর্মির ফরটীন্‌থ্ রেজিমেন্টে আছেন। অস্ত্র চালনায় বিশেষ যোগ্যতার কারণে তেইশ বছর বয়সেই ক্যাপটেন হয়েছেন। সাদা পোশাক পরে এসেছেন তিনি।

'যাক, ব্যাপারটা একটা পরিণতির দিকে চলেছে শেষ পর্যন্ত,' আমার দিকে বাউ করে লুইকে বলল মশিয়ে মাখতেল্লি, 'তোমার চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে মশিয়ে শাতো-রোনোর সেকেন্ডরা আজই তোমার এখানে হাজির হবে।'

'ওরা এসে চলে গেছে,' বলল লুই।

'নাম-ঠিকানা রেখে গেছে?'

'এই যে ওদের কার্ড।'

'বেশ। তোমার লোকটা বলল লাঞ্চ তৈরি হয়ে গেছে; তাহলে খাওয়া সেরেই যেতে পারি দেখা করতে, কি বলো?'

আমরা মন থেকে ব্যাপারটা দূর করে ডাইনিং-রুমে গিয়ে বসলাম। লুই আমার কর্সিকা-ভ্রমণের কথা তুলল; সংক্ষেপে সবই বললাম। আগামী কাল মশিয়ে দো শাতো-রোনোর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলার পর অন্য বিষয়ে সহজেই মন দিতে পারল লুই। প্রশ্ন করে করে ওর ভাই আর মায়ের প্রতিটি কথা বার বার শুনল। ভাইয়ের গর্বে চকচক করে উঠল ওর চোখ। অখলান্দ আর কলোনার ঝগড়া মিটাতে বেচারা ভাইটিকে কত কষ্ট করতে হয়েছে জেনে উদ্বেলিত হলো।

ঘড়িতে বারোটা বাজল।

'মেসিয়া,' বলল লুই, 'আপনাদের তাগাদা দিচ্ছি না, তবে ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করার সময় প্রায় হয়ে এল; দেরি করলে ওঁরা মনে করবেন আমরা ইচ্ছেকৃতভাবে অমার্জিত ব্যবহার করছি।'

'এ নিয়ে আপনি ভাববেন না,' বললাম আমি। 'ওঁরা এখান থেকে গেছেন ঘণ্টা দুয়েকের বেশি হবে না। আমাদেরকে খবর দিয়ে আনাতে আপনার সময় লাগবে না?'

'সে যাই হোক,' বলল বাখন জিয়োখদানো, 'কথাটা লুই ঠিকই বলেছে।'

'তাহলে,' লুইয়ের দিকে ফিরলাম, 'আমাদের জানা দরকার কোন্ অস্ত্র আপনার পছন্দ—তলোয়ার না পিস্তল?'

'হায় খোদা! পছন্দ?' হাসল লুই। 'আপনাকে তো বলেইছি, দুটোই আমার কাছে সমান, এটা বা ওটা কোনটা সম্পর্কেই কিচ্ছু জানি না আমি। তবে মশিয়ে দো শাতো-রোনো সম্ভবত পছন্দ করা-করি থেকে রেহাই দেবেন আমাকে। তাঁর ধারণা তাঁকে অপমান করা হয়েছে, কাজেই পছন্দের অস্ত্র বেছে নেয়ার অধিকার তাঁরই।'

'কে কাকে অপমান বা অসন্তুষ্ট করল সেটা বিচারসাপেক্ষ বিষয়। একজন ভদ্রমহিলার অনুরোধে আপনি শুধু তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন।'

'শুনুন,' লুই বলল, 'আমার মনে হয়, এসব নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে গেলে মনে হতে পারে আমি ব্যাপারটা মিটমাট করার চেষ্টা করছি। আপনারা জানেন, আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ, অন্তত যুদ্ধবাজ নই। জীবনে এই প্রথম কোনও ঝগড়ায় জড়ালাম। সেইজন্যেই যেটা সঠিক সেটাই করতে চাই।'

'আপনার পক্ষে কথাটা বলা সহজ; আপনি শুধু নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিচ্ছেন, কিন্তু আপনার পরিবারকে বুঝ দেয়ার দায়িত্ব বর্তাবে আমাদের ওপর—ফলাফল যা-ই হোক না কেন।'

'এই ব্যাপারে একটুও দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি আমার মাকে, আমার ভাইকে চিনি। ওরা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে: "লুই কি ভদ্রলোকের মত আচরণ করেছিল?" আপনি যদি বলেন: "হ্যাঁ।" ওরা বলবে: "তাহলে ঠিক আছে।" '

'বেশ তো, ভাল কথা। কিন্তু তারপরেও আমাদের জানা দরকার আপনার পছন্দের অস্ত্র কোন্‌টা।'

'তাহলে···ওরা যদি পিস্তলের কথা বলে, চট্ করে রাজি হয়ে যাবেন।'

'আমারও তাই মত,' বলল বাখন।

'তাহলে পিস্তলই সই,' বললাম। 'আপনারা দুজনেই যখন এ ব্যাপারে একমত। তবে পিস্তলটা বড় জঘন্য অস্ত্র।'

'হাতে সময় আছে? এখন থেকে আগামীকাল সকাল—এর মধ্যে কি আমার

পক্ষে তলোয়ার চালানো শিখে নেয়া সম্ভব?'

'না। তবে গ্রিসিয়ের কাছে একটা লেস্‌ন্‌ নিতে পারলে হয়তো আত্মরক্ষার কায়দাটা শিখে ফেলতে পারতেন।'

হাসল লুই।

'বিশ্বাস করুন,' বলল সে, 'কাল আমার কি হবে সেটা লেখা হয়ে গেছে আগেই। যত যাই করি না কেন, লিখন পাল্টাবে না।'

এরপর হাত মিলিয়ে আমরা নিচে নেমে এলাম। প্রতিপক্ষের যে সাহায্যকারী সবচেয়ে কাছে থাকে তার বাসার দিকে রওনা হলাম। বেশিদূর যেতে হলো না। ভাসকাঁ রেনে দো শাতোগ্রঁ-র বাড়িতে পৌঁছে শুনলাম মশিয়ে লুই দো ফ্রানশির লোক ছাড়া আর কারও সঙ্গে এখন তিনি দেখা করবেন না। উদ্দেশ্য জানালাম ভৃত্যকে, কার্ড দিলাম; সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে নিয়ে বসানো হলো আমাদের।

অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও ধুরন্ধর লোক ভাসকাঁ দো শাতোগ্রঁ। উনি বললেন, আরেক সেকেন্ড মশিয়ে দো বোয়াসির বাড়িতে আমাদের আর যাওয়ার দরকার নেই; তাঁরা দুজন আলাপ করে ঠিক করেছেন আমরা প্রথমে যাঁর বাসায় যাব তিনিই অপরজনকে খবর পাঠিয়ে ডেকে নেবেন। খবর নিয়ে বেরিয়ে গেল ভৃত্য।

অপেক্ষার সময়টুকু আমরা অপেরা, রেস, শিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে খুচরো আলাপ করলাম, যে কাজে এসেছি সে বিষয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করলাম না। মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে পড়লেন মশিয়ে আদ্রিয়েন দো বোয়াসি। এঁরা জানালেন, কোনও বিশেষ অস্ত্রের প্রতি পক্ষপাত নেই তাঁদের, কারণ মশিয়ে দো শাতো-রোনো তলোয়ার-পিস্তল দুটোতেই সমান সিদ্ধহস্ত। মশিয়ে দো ফ্রানশি যে অস্ত্র পছন্দ করবেন তাতেই তাঁদের সম্মতি থাকবে। ইচ্ছে করলে টস্‌ করেও স্থির করা যায়। আমরা টস্‌ করলাম, স্থির হলো: দ্বন্দ্বযুদ্ধের অস্ত্র হবে পিস্তল।

তারপর স্থান ও কাল স্থির করা হলো। আগামীকাল সকাল নয়টায় বোয়া দো ভানসাঁ-এ দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে, বিশ কদম দূরে থাকবে দুই প্রতিপক্ষ, তিনবার তালি বাজানো হবে—তৃতীয় তালির সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়বে দুজন দুজনের দিকে।

ফ্রানশিকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানাতে ফিরে গেলাম।

সন্ধেয় বাড়ি ফিরে মশিয়ে দো শাতো-রোনোর সেকেন্ড দুজনের কার্ড পেলাম।

ষোলো

সেদিনই রাত আটটায় লুই দো ফ্রানশির বাসায় গেলাম। জানতে চাইলাম, আমার প্রতি তার কোনও বিশেষ নির্দেশ আছে কিনা। কেমন যেন রহস্যময় ভঙ্গিতে সে বলল আগামীকাল সকালে জানাবে। বলল, 'রাতেই আসে পরামর্শ, উপদেশ।'

কাজেই পরদিন নির্ধারিত সময়ের আধঘণ্টা আগেই পৌঁছে গেলাম লুই দো ফ্রানশির বাসায়। সকাল সাড়ে সাতটায়।

পড়ার ঘরে কি যেন লিখছে ও ব্যস্ত-সমস্ত ভঙ্গিতে। দরজা খোলার শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। অদ্ভুত ফ্যাকাসে চেহারা।

'কিছু মনে করবেন না,' বলল লুই, 'মাকে চিঠি লিখছি, শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। বসুন, খবরের কাগজ এসে থাকলে···দাঁড়ান, লা প্রেস-এ চমৎকার একটা সিরিয়াল আছে, এই যে।'

কাগজটা নিলাম, অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম; চেহারাটা যে রকম ফ্যাকাসে

দেখাচ্ছে, তার সঙ্গে ওর শান্ত ব্যবহার আর নরম গলার স্বর একেবারেই মানাচ্ছে না।

পড়ায় মন দেয়ার চেষ্টা করলাম; কিন্তু চোখ এগিয়ে যায়, মনে কোনও ছাপ পড়ে না।

'শেষ,' পাঁচ মিনিট পর সিধে হলো লুই। বেল বাজিয়ে ভৃত্যকে ডাকল। ও আসতে বলল, 'জোসেফ, আগামী দশ মিনিট কারও সঙ্গে দেখা করব না, জিয়োখদানোর সঙ্গেও না—বুঝতে পেরেছ? এই ভদ্রলোকের সঙ্গে জরুরী কথা আছে, যেন বাধা না পড়ে—কেমন?'

মাথা ঝুঁকিয়ে 'বাউ' করে দরজা বন্ধ করে দিল জোসেফ।

'আলেকজন্দ্রে, তোমার ওপর একটা দায়িত্ব দিতে চাই,' বলল লুই। 'জিয়োখদানো একজন কর্সিকান, ওর ধ্যান-ধারণাও কর্সিকান; তাই ওর ওপর ভরসা রাখতে পারছি না—ওকে স্রেফ চুপ করে থাকতে বলব, ব্যস; কিন্তু তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই, তার আগে তোমার কথা দিতে হবে—যা বলব অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে তুমি।'

'নিশ্চয়ই! সেটাই তো "সেকেন্ড"-এর কর্তব্য, তাই না?'

'গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, কারণ দ্বিতীয় বিপর্যয়ের হাত থেকে হয়তো তুমি রক্ষা করতে পারবে আমাদের পরিবারকে।'

'দ্বিতীয় বিপর্যয়?'

'পড়ে দেখো,' চিঠিটা এগিয়ে দিল ও আমার দিকে, 'মাকে লেখা এ-চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবে পরিষ্কার।'

ওর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়তে শুরু করলাম।

'প্রিয় মা আমার,

'তুমি কতখানি সাহসী, কতটা ঈশ্বর-অনুরাগী যদি না জানতাম, তাহলে দুঃসংবাদটা দেয়ার আগে তোমাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমি জানি, তার দরকার নেই, তাই সরাসরিই বলছি: এ-চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছবে তখন তোমার থাকবে শুধু এক ছেলে।

'লুসিয়েন, প্রিয় ভাই, মাকে আমাদের দুজনের সমান ভালবেসো।

'গত পরশু "ব্রেন ফিভারে" আক্রান্ত হয়েছি। শুরুতে টের পাইনি; ডাক্তার যখন এলো তখন দেরি হয়ে গেছে। মা, আমি মারা যাচ্ছি।

'আমার মৃত্যুর পনেরো মিনিটের মধ্যেই এ-চিঠি রওনা হয়ে যাবে। আমি তোমাদের জানাতে চাই, কোনও দুঃখ নিয়ে মারা যাইনি আমি; একমাত্র দুঃখ আমার প্রিয় মায়ের আদর আর প্রিয় ভাইয়ের ভালবাসা হারাতে চলেছি।

'বিদায়, মা।

'কেঁদো না। আমার আত্মাটাকেই তো ভালবাসো তুমি, এই দেহটা নয়। তুমি স্থির জেনো, মা, যেখানেই থাকি, চিরকাল এই আত্মা তোমাকে ভালবেসে যাবে।

'বিদায়, লুসিয়েন।

'তোমার মত ভাই হয় না। প্রিয় ভাই, আমাদের মাকে ফেলে কোথাও যেয়ো না; মনে রেখো, তুমি ছাড়া আর কেউ থাকল না মায়ের।

'তোমার ছেলে,
'তোমার ভাই,
'লুই দো ফ্রানশি।'

চিঠি শেষ করে ওর দিকে চাইলাম।

'এর অর্থ কি, লুই?'

'বুঝতে পারছ না?'

'না।'
'ঠিক ন'টা দশে খুন হতে চলেছি আমি আজ।'
'খুন হতে চলেছ?'
'হ্যাঁ।'
'মাথা খারাপ তোমার! এ চিন্তা ঢুকল কেন তোমার মাথায়?'
'আমি পাগলও হইনি, ভয়ও পাইনি, বন্ধু। আমাকে আগাম জানানো হয়েছে।'
'আগাম? কে আগাম জানাল?'
'আমার ভাই তোমাকে বলেনি,' মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল লুই, 'যে আমাদের পরিবারের পুরুষরা একটা বিশেষ সুবিধে ভোগ করে?'
'বলেছে,' উত্তর দিলাম। নিজের অজান্তে শিউরে উঠলাম একবার। 'বলেছে ভৌতিক ছায়ামূর্তি দেখা দেয়।'
'ঠিক। কাল রাতে আমার বাবা এসেছিলেন; সেজন্যেই আজ এত ফর্সা দেখাচ্ছে আমাকে। মৃত কাউকে দেখলে সাদা হয়ে যায় জীবিতরা।'
বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ওর দিকে, ছম ছম করছে গা।
'গত রাতে তুমি তোমার বাবাকে দেখেছ, বলছ?'
'হ্যাঁ।'
'তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন?'
'হ্যাঁ। আমার মৃত্যুসংবাদ দিয়েছেন।'
'নিশ্চয়ই ভয়ানক কোনও দুঃস্বপ্ন দেখে...'
'ভয়ানক ঠিকই, তবে স্বপ্ন নয়—সত্যি।'
'ঘুমিয়ে ছিলে?'
'না, জেগে...তুমি বিশ্বাস করো না বাবা তার ছেলের কাছে আসতে পারে?'
মাথা ঝাঁকালাম; কারণ জানি, এটা সম্ভব—আমার নিজের জীবনেও ঘটেছে।
'ঠিক কিভাবে কি ঘটল খুলে বলো তো?'
'সহজ, স্বাভাবিক ভাবেই। শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম, অপেক্ষা করছিলাম বাবার জন্যে, কারণ আমি জানি, আমার বিপদ দেখলে উনি দেখা দেবেন। মাঝরাতে দেখলাম বাতির আলো কমে গেল, আস্তে খুলে গেল দরজা, বাবা এসে ঢুকলেন ঘরে।'
'কোন্ আকারে?' জিজ্ঞেস করলাম।
'বেঁচে থাকতে যে-পোশাক পরতেন, সেই সাধারণ পোশাকই ছিল পরনে, তবে খুবই ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল তাঁকে, আর চোখের দৃষ্টিতে কোনও অভিব্যক্তি ছিল না।'
'হায়, খোদা!'
'ধীর পায়ে আমার খাটের পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমি কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলাম। ডাকলাম, "এসো, বাবা!" আরও কাছে এসে আমার দিকে তাকালেন। আমার মনে হলো নিষ্প্রভ দুই চোখে ভালবাসার জ্যোতি দেখতে পেলাম।'
'বাপরে! ভয়ই লাগছে...তারপর?'
'তারপর ঠোঁট নড়ে উঠল। কিন্তু কী আশ্চর্য, আওয়াজ হলো না, অথচ নিজের ভেতর কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেলাম। অনেকটা প্রতিধ্বনির মত, পরিষ্কার, কিন্তু কেমন যেন ফাঁপা।'
'কি বললেন তিনি?'
'আমাকে বললেন: "ঈশ্বরের কথা ভাবো, লুই।"
'জিজ্ঞেস করলাম, "এই ডুয়েলে কি আমি মারা যাব, বাবা?"
'দেখলাম, ফ্যাকাসে গাল বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু নেমে এল।

‘ “কখন?” জানতে চাইলাম।

‘দেয়াল ঘড়ির দিকে আঙুল তুললেন তিনি। তাকিয়ে দেখি: নটা বেজে দশ মিনিট।

‘ “বুঝতে পারলাম, বাবা,” আমি বললাম, “খোদার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে। মাকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে সত্যি, কিন্তু তোমাকে তো পাচ্ছি।”

‘আবছা হাসির রেখা ফুটল মুখে, হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন। আপনা-আপনিই খুলে গেল দরজা, বাবা বেরিয়ে যেতে বন্ধ হয়ে গেল নিজে থেকে।’

এতই সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে গল্পটা শোনাল ও যে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, হয় ও যা বলছে সত্যিই তাই ঘটেছে; নয়তো প্রচণ্ড মানসিক চাপের মুখে মতিভ্রম বা দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছিল, আর ও সেটাকেই সত্য বলে ধরে নিয়েছে।

কপালের ঘাম মুছলাম।

‘আমার ভাইকে তো তুমি চেনো। তাই না?’ বলল লুই।

‘হ্যাঁ।’

‘ডুয়েল লড়তে গিয়ে আমি মারা পড়েছি জানতে পারলে ও কি করবে বলে তোমার ধারণা?’

‘সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে এখানে তোমার হত্যাকারীর খোঁজে।’

‘ঠিক। যদি ও-ও মারা পড়ে তাহলে? তাহলে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে আমার মা।’

‘হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, এ দুঃখের কোনও তুলনা নেই।’

‘কাজেই, সেটা এড়াবার জন্যেই আমার এই চিঠি। মস্তিষ্ক-প্রদাহে মারা গেছি জানলে প্রতিশোধ নিতে ছুটে আসবে না আমার ভাই, মাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে থাকবে ও তার পাশে; খোদার ইচ্ছের ওপর কারও হাত নেই, মা-ও একসময় দুঃখ ভুলবে, জানবে না মানুষের চক্রান্তে মরতে হয়েছে আমাকে। অবশ্যই যদি না…’

‘যদি না কী?’

‘যদি না…’ একটু থামল লুই, ‘না, না। আশাকরি তা হবে না।’

বুঝলাম, কোনও ব্যক্তিগত বিষয়ে নিজের মনে কথা বলছে ও, তাই আর চাপ দিলাম না। তাছাড়া, ঠিক সেই মুহূর্তেই খুলে গেল দরজা।

‘এই যে, দো ফ্রানশি,’ বলল বাখন দো জিয়োখদানো, ‘আর তোমার বারণ মানা সম্ভব হলো না। আটটা বাজে…নটায় আমাদের পৌঁছবার কথা। সাড়ে চার মাইল যেতে হবে আমাদের, সময় মত পৌঁছতে হলে এখনই রওনা হওয়া দরকার।’

‘এই তো, আমি তৈরি,’ বলল লুই। ‘ভেতরে এসো, মশিয়ের সঙ্গে যা কথা ছিল, হয়ে গেছে।’

ঠোঁটে তর্জনী রেখে আমার দিকে তাকাল লুই। টেবিল থেকে একটা মুখবন্ধ খাম তুলে এগিয়ে দিল বাখনের দিকে, ‘ধরো, এটা তোমার জন্যে। আমার যদি ভাল-মন্দ কিছু হয় চিঠিটা খুলে পড়বে, এবং আমার অনুরোধ, ওতে যা বলা হয়েছে তুমি ঠিক তাই করবে।’

‘কথা দিচ্ছি।’

‘তোমার তো অস্ত্র জোগাড় করবার কথা ছিল, তাই না?’ আমার দিকে ফিরল লুই।

‘হ্যাঁ। কিন্তু দেখলাম, একটা পিস্তল ঠিক মত কাজ করছে না। যাওয়ার পথে ডেভিসিন থেকে একটা পিস্তলের কেস তুলে নেব।’

মৃদু হেসে আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল লুই। বুঝতে পেরেছে, আমি চাই না আমার পিস্তল দিয়ে কেউ ওর দিকে গুলিবর্ষণ করুক।

‘গাড়ির কি ব্যবস্থা?’ জানতে চাইল লুই। ‘জোসেফকে ডেকে আনতে

পাঠাব?'

'আমার কুপে আছে,' বলল বাখন, 'তিনজন ধরবে ওতে। দেরি করে ফেলেছি আমরা, আমারটায় গেলে একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে, ঘোড়াগুলো তাজা।'

'তাহলে রওনা হওয়া যাক,' বলল লুই।

নিচে নামলাম আমরা। দরজার কাছে অপেক্ষা করছে জোসেফ।

'আমি কি সঙ্গে আসব, মশিয়ে?' জানতে চাইল সে।

'না, জোসেফ,' বলল লুই। 'কোনও দরকার নেই, তুমি থাকো।' কথাটা বলে আমাদের থেকে একটু পিছিয়ে গেল। 'এই যে, ধরো,' জোসেফের হাতে ছোট একটা টাকার থলে গুঁজে দিল সে, 'আর, যদি কোনও কারণে কখনও তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে থাকি, মাফ করে দিয়ো।'

'মশিয়ে!' ফুঁপিয়ে উঠল জোসেফ, পানি বেরিয়ে এসেছে চোখ থেকে, 'এর মানে কি!'

'চুপ!' বলেই এক লাফে গাড়িতে উঠে দুজনের মাঝখানে বসে পড়ল সে।

'মানুষটা খুব ভাল ছিল,' জোসেফের দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে বলল লুই। 'তোমরা যদি ওর কোনও উপকারে আসো, আমি কৃতজ্ঞ থাকব।'

'ওকে কি বিদায় করে দিয়েছ?' জানতে চাইল বাখন।

'না,' মৃদু হেসে বলল লুই, 'আমিই বিদায় নিচ্ছি।'

ডেভিসিনে থেমে একজোড়া পিস্তল, কিছু বারুদ আর বুলেট নিয়ে নিলাম, তারপর দ্রুতবেগে ছুটলাম আবার।

সতেরো

নয়টা বাজতে পাঁচ মিনিট থাকতে পৌঁছলাম আমরা ভানসাঁ-এ। একই সময়ে আরেকটা গাড়িতে চড়ে পৌঁছল মশিয়ে দো শাতো-রোনো ও তার সেকেন্ড দুজন। ভিন্ন ভিন্ন পথে দু'দল জঙ্গলে ঢুকলাম। আমাদের কোচম্যানরা গ্রঁ অ্যাভিনিউ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে আমাদেরকে। কয়েক মিনিটেই পৌঁছে গেলাম নির্ধারিত জায়গায়।

'একটা কথা, মেসিয়া,' গাড়ি থেকে নেমেই বলে উঠল লুই, 'খেয়াল রেখো, ওর সঙ্গে কোনও আপসে আমি রাজি নই।'

'কিন্তু যদি...' আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, থামিয়ে দিল ও আমাকে।

'প্রিয় বন্ধু, তোমাকে যে গল্প শুনিয়েছি; তারপরেও তুমি নিশ্চয়ই এরকম কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করবে না, কিংবা কারও প্রস্তাবে রাজিও হবে না।'

অগত্যা ওর কথা মেনে নিতেই হলো। ওকে গাড়ির পাশে রেখে আমরা এগোলাম মেসিয়া দো বোয়াসি আর ভাসকাঁ দো শাতোগ্রঁর সঙ্গে কথা বলতে। বাখন দো জিয়োখদানো পিস্তলের কেসটা নিল একহাতে। আমরা পরস্পরকে 'বাউ' করলাম।

'মেসিয়া,' বাখন জিয়োখদানো শুরু করল, 'সংক্ষেপে সারতে হবে কাজটা। আনুষ্ঠানিকতায় দেরি করলে যে-কোনও সময় কাজে বাধা পড়তে পারে। কথা ছিল, আমরা অস্ত্র আনব, এই দেখুন, দয়া করে পরীক্ষা করুন। বন্দুকের দোকান থেকে এইমাত্র কিনে আনা হয়েছে। নিশ্চয়তা দিয়ে এটুকু বলতে পারি, মশিয়ে লুই দো ফ্রানশি এখন পর্যন্ত এগুলো চোখেও দেখেননি।'

'নিশ্চয়তার কোনও প্রয়োজন নেই, মশিয়ে। আমরা আপনাদের সম্পর্কে জানি।' বলে একটা পিস্তল হাতে তুলে নিল মশিয়ে শাতোগ্রঁ, মশিয়ে দো বোয়াসি

নিল অপরটা। ককিংস্প্রিং আর বোর পরীক্ষা করে দেখল সেকেন্ড দুজন।

'সাধারণ পিস্তল এগুলো, এর আগে গুলি ছোঁড়া হয়নি কোনদিন,' বলল বাখন। 'প্রশ্ন হচ্ছে, ডাবল-অ্যাকটিং ট্রিগার ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না।'

'আমার মনে হয়,' বলল মশিয়ে দো বোয়াসি, 'যার যা পছন্দ, বা যে যাতে অভ্যস্ত সে তাই ব্যবহার করতে পারে।'

'ঠিক আছে,' বাখন জিয়োখদানো রাজি হলো, 'উভয়েই সমান সুযোগ পেলে আমাদের আপত্তি নেই।'

'তাহলে এই কথাই রইল, আপনারা মশিয়ে দো ফ্রানশিকে জানিয়ে দিন, আমরা জানাচ্ছি মশিয়ে দো শাতো-রোনোকে।'

'বেশ তো,' বলল বাখন, 'এবার আরেকটা বিষয়। যেহেতু অস্ত্র দুটো আমরা এনেছি, আপনারা গুলি ভরবেন এতে।'

বুলেট আর বারুদ নিয়ে মেতে গেল ওরা তিনজন। আমার এসবে অংশ নেয়ার ইচ্ছে নেই, আমি লুইয়ের কাছে ফিরে গেলাম। আমাকে আসতে দেখে মৃদু হাসল সে।

'তোমাকে যা-যা করতে বলেছি সব মনে আছে তো?' জানতে চাইল লুই। 'তাছাড়া জিয়োখদানোর কাছ থেকেও কথা আদায় করবে, যেন আজকের ঘটনা কোন অবস্থাতেই আমার মা কিংবা ভাইয়ের কানে না যায়। বিশেষ করে তুমি একটু দেখবে, যেন খবরের কাগজে এই ঘটনার বিবরণ না ওঠে, অথবা, যদি ওঠেই, নাম-ধাম যেন ছাপা না হয়।'

'এখনও তোমার ধারণা মৃত্যু তোমার হবেই?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার শান্ত ভাব দেখে ভাবতে ইচ্ছে করছে যে হয়তো তোমার কিছু ভুল হয়েছে, হয়তো আগাম খবর অবশ্যম্ভাবী কিছু নয়।'

'সন্দেহ রেখো না মনে,' বলল লুই। ঘড়িটা বের করল পকেট থেকে। 'একজন সত্যিকার কর্সিকান হিসেবে মরতে চাই বলেই কোন ভয়ডর দেখতে পাচ্ছ না আমার মধ্যে। আর সাত মিনিট বাঁচব আমি। ঘড়িটা রাখো, এটা আমার স্মৃতিচিহ্ন। খুব ভাল ঘড়ি, ব্রিগুয়ে কোম্পানীর।'

ঘড়িটা নিয়ে ওর হাত চেপে ধরলাম।

'ঠিক আট মিনিটের মাথায় এটা তোমাকে ফেরত দিতে চাই আমি।'

'এ নিয়ে আর কোনও কথা নয়, প্লীজ,' বলল লুই, 'এই যে, এসে পড়ল সবাই।'

'মেসিয়া,' বলল ভাসকাঁ দো শাতোগ্রঁ, 'আমার ধারণা, কাছেই, হাতের ডানধারে ছোট্ট একটা মাঠ মত জায়গা আছে। গতবছর ওটা আমি এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যবহার করেছিলাম। আসুন না, ওটা খুঁজে বের করি? এই অ্যাভিনিউয়ে গোলাগুলির ব্যাপারে লোকে আপত্তি করতে পারে।'

'বেশ তো, রাস্তা দেখান, মশিয়ে,' বলল বাখন, 'আমরা আসছি পিছন পিছন।'

ভাসকাঁ পথ দেখাল, আমরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে ওর পিছু পিছু এগোলাম। গজ ত্রিশেক যাওয়ার পর ছোট্ট একটা মাঠ মত জায়গায় গিয়ে পৌঁছলাম। বোঝা গেল এটা একটা পুকুর ছিল এক সময়, এখন শুকনো। চারধারের পাড় সামান্য উঁচু। মনে হলো, যে-কাজে এসেছি তার জন্যে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর হতে পারে না। যেন নাটকের সাজানো স্টেজ।

'মশিয়ে মাখতেল্লি,' বলল ভাসকাঁ, 'আমার সঙ্গে এসে দূরত্বটা মেপে দেখবেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল বাখন, পাশাপাশি হেঁটে বিশ কদম দূরত্ব নির্ধারণ করল

দুজনে।

আমি দাঁড়িয়ে আছি ফ্রানশির পাশে। হঠাৎ ও বলে উঠল, 'ভাল কথা, আমার লেখার টেবিলের ওপর আমার উইলটা পাবে।'

'ঠিক আছে,' বললাম, 'দেখব সেটা।'

'মেসিয়া, আপনারা যদি তৈরি হয়ে নেন,' বলল ভাসকাঁ দো শাতোগ্রঁ।

'আমি তৈরি,' বলল লুই। 'বিদায়, বন্ধু! আমার জন্যে যা কষ্ট করেছ, সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ,' একটু হাসল, 'আরও যেটুকু কষ্ট রয়েছে তোমাদের কপালে, তার কথা আর নাই বললাম।'

ওর হাতটা নিজের হাতে নিলাম। ঠাণ্ডা, কিন্তু দৃঢ় নিষ্কম্প।

'কাল রাতের সব ঘটনা ভুলে যাও, লুই,' বললাম, 'যতটা ভালভাবে পারো, লক্ষ্য স্থির করে গুলি করবে।'

'ফেখইশুত মনে আছে তোমার?'

'আছে।'

'তাহলে তো জানোই, প্রতিটা বুলেটের নিজ-নিজ ঠিকানা আছে···গুড-বাই।'

কয়েক পা এগিয়ে বাখন জিয়োখদানোর কাছ থেকে পিস্তল নিল লুই, কক করল, তারপর দাঁড়াল গিয়ে রুমাল রেখে চিহ্ন দেয়া জায়গাটায়।

মশিয়ে দো শাতো-রোনো আগেই দাঁড়িয়ে গেছে নিজের জায়গায়।

নিশ্চুপ, গম্ভীর কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। এই ফাঁকে প্রতিপক্ষ দুজন যে-যার সেকেন্ডদের, প্রতিপক্ষের সেকেন্ডদের এবং সবশেষে একে অপরকে আনুষ্ঠানিক অভিবাদন করল।

মশিয়ে দো শাতো-রোনোর চাল-চলন ও স্মিত হাসি দেখে বোঝা গেল এসবে সে রীতিমত অভ্যস্ত, আত্মবিশ্বাসেও কোনও ঘাটতি নেই। আমার মনে হলো, খুব সম্ভব এটাও তার অজানা নেই যে জীবনে এই প্রথম পিস্তল ধরছে লুই।

লুই দাঁড়িয়ে আছে শান্ত, সমাহিত; আত্মমর্যাদায় উঁচু মাথা; মনে হচ্ছে মার্বেলের মূর্তি।

'কি হলো, মেসিয়া?' বলল শাতো-রোনো। 'দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা অপেক্ষা করছি।'

শেষবারের মত আমার দিকে তাকাল লুই, একটু হেসে, দৃষ্টিটা ওপর দিকে তুলল।

'তাহলে, মেসিয়া,' ঘোষণার ভঙ্গিতে বলল শাতোগ্রঁ, 'আপনারা তৈরি।'

হাত তালি শুরু করল:

'এক···দুই··· তিন···'

প্রায় একই সঙ্গে দুটো গুলির আওয়াজ হলো।

তাকিয়ে দেখলাম, দুইবার পাক খেল লুই দো ফ্রানশির শরীরটা, তারপর বসে পড়ল হাঁটুতে ভর দিয়ে। মশিয়ে দো শাতো-রোনো দাঁড়িয়ে রয়েছে, বগলের কাছে ফুটো হয়ে গেছে কোট।

দৌড়ে গেলাম লুইয়ের পাশে।

'জখম হয়েছ, লুই?' জিজ্ঞেস করলাম।

উত্তর দিতে চেষ্টা করল ও, কিন্তু পারল না; রক্ত-লাল ফেনা দেখা দিল ওর ঠোঁটের ফাঁকে। পিস্তলটা ছেড়ে দিয়ে বুকের ডানদিকটা চেপে ধরল ও। দেখলাম ওখানে কোটের গায়ে ছোট্ট একটা ফুটো।

'বাখন,' চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ছুটে গিয়ে ব্যারাক থেকে একজন আর্মি সার্জেনকে নিয়ে আসুন!'

কিন্তু দো ফ্রানশি মাথা নেড়ে বারণ করল জিয়োখদানোকে। বোঝাতে চাইছে,

অর্থহীন হবে এই ছোটাছুটি। আরেক হাঁটু ঠেকল মাটিতে।

মশিয়ে দো শাতো-রোনো ঘুরেই হাঁটা ধরল গাড়ির দিকে। কিন্তু তার সেকেন্ড দুজন এসে দাঁড়াল লুইয়ের পাশে। ইতোমধ্যে ওর কোট খুলে ওয়েইস্টকোট ও শার্ট ছিঁড়ে ফেলেছি আমরা। বুকের ডানপাশ দিয়ে ঢুকেছে বুলেট, পাঁজরের ষষ্ঠ হাড়ের ঠিক নিচ দিয়ে; বেরিয়ে গেছে বাম নিতম্বের একটু ওপর দিয়ে। মৃত্যুপথযাত্রীর প্রত্যেক শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দু'দিকের ক্ষত থেকে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। জখম যে মারাত্মক, সন্দেহ নেই।

'মশিয়ে দো ফ্রানশি,' বলল ভাসকাঁ দো শাতোগ্রঁ, 'বিশ্বাস করুন, বিরোধের এই পরিণতিতে আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত, আর আমরা এ-ও জানি, অন্তিম মুহূর্তে মশিয়ে শাতো-রোনোর বিরুদ্ধে আপনি মনে কোনও বিদ্বেষ পুষে রাখবেন না।'

'না, না,' বিড় বিড় করে বলল আহত লুই, 'আমি···আমি ওকে ক্ষমা করে দিলাম···তবে, ওকে কোথাও···সরে যেতে···পালিয়ে যেতে বলবেন।' অনেক কষ্টে আমার দিকে ফিরে দুর্বল কণ্ঠে বলল, 'তোমার প্রতিজ্ঞা মনে রেখো, আলেক···'

'কসম খেয়ে বলছি, লুই, তুমি যা বলেছ তাই করা হবে।'

'এবার,' হাসি-হাসি হলো মুখটা। 'আমার ঘড়ির দিকে তাকাও।'

কথাটা বলেই জোরে শ্বাস টানল একবার, তারপর পড়ে গেল পিছন দিকে।

মারা গেল মশিয়ে লুই দো ফ্রানশি।

ওর দেয়া ঘড়িটার দিকে চাইলাম: ন'টা বেজে দশ মিনিট।

আমরা ওর বাসায় বয়ে আনলাম দেহটা। বাখন দো জিয়োখদানো গেল পুলিশের জেলাপ্রধানের কাছে ঘটনার বিবরণ দিয়ে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে। আমি আর জোসেফ মৃতদেহ নিয়ে এলাম দোতলায়, ওর ঘরে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে জোসেফ।

দেয়াল ঘড়িটার দিকে চোখ গেল, দেখলাম, চাবি না দেয়ায় থেমে গেছে ওটা কাঁটায় কাঁটায় ন'টা বেজে দশে।

বাখন জিয়োখদানো ফিরে এল পুলিশ নিয়ে। জিনিসপত্র সব সীল করার জন্যে এসেছেন অফিসার।

লুইয়ের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের খবর জানিয়ে চিঠি পাঠানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল বাখন, আমি তাকে অনুরোধ করলাম কিছু করার আগে যেন লুই দো ফ্রানশির দেয়া চিঠিটা একবার পড়ে। এতে লুই ওকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছে, যেন লুসিয়েন ও অন্যান্যদের কাছে ওর মৃত্যুর কারণটা গোপন রাখে, দেশের কারও কানে যেন কথাটা না যায়, যেন কোন জাঁকজমক ছাড়াই খুব সাদামাঠা ভাবে তাকে কবর দেয়া হয়।

বন্ধুর শেষ অনুরোধ রক্ষা করবে বাখন—কথাটা জেনে নিয়ে আমি মশিয়ে দো বোয়াসি ও মশিয়ে দো শাতোগ্রঁর সঙ্গে দেখা করতে চললাম; তাদের অনুরোধ করব যেন এই দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে নীরব থাকে, এবং যেন মশিয়ে দো শাতো-রোনোকে কিছুদিনের জন্যে হলেও প্যারিসের বাইরে কোথাও সরে থাকতে রাজি করায়।

আমার কথায় রাজি হলো দুজনেই; রওনা হয়ে গেল মশিয়ে দো শাতো-রোনোর সঙ্গে কথা বলতে। মাদাম দো ফ্রানশিকে মস্তিষ্ক-প্রদাহে ওর মৃত্যুর খবর জানিয়ে লেখা লুইয়ের চিঠিটা পোস্ট করব বলে চললাম। তাছাড়া যতটা পারা যায় সামাল দিতে হবে সংবাদপত্রে খবর ছাপার ব্যাপারটাও।

আঠারো

এ ধরনের নারীঘটিত ডুয়েল নিয়ে সাধারণত সমাজে, বিশেষ করে সংবাদপত্রগুলোতে, যে তুলকালাম কাণ্ড হয়, সেই তুলনায় বলতে গেলে প্রায় কিছুই হলো না।

উল্টোপাল্টা প্রচারণার শিঙা ফুঁকতে ওস্তাদ সাময়িকীগুলোও নীরব থাকল।

অল্প কয়েকজন বন্ধু গোরস্তানে গেলাম। ওর ইচ্ছে অনুযায়ী ওকে অনাড়ম্বর ভাবেই মাটি দেয়া হলো।

মশিয়ে দো শাতো-রোনোকে তার সেকেন্ডরা প্যারিস ছেড়ে যেতে রাজি করাতে পারেনি—প্রত্যাখ্যান করেছে সে এই প্রস্তাব।

একবার মনে হয়েছিল, সুলাকাখোয় আমিও একটা চিঠি লিখব কি না। কারণ, লুইয়ের এই মিথ্যা বলার পেছনে যুক্তি যাই থাকুক, উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক; মা ও ভাইয়ের কাছে মৃত্যুর মিথ্যা খবর জানানোর ব্যাপারটা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। সিদ্ধান্তটা লুই নিজে নিয়েছে, ওর যুক্তিগুলোও অত্যন্ত জোরাল—তবু আমার মন মানছে না।

তবে শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম, লুইয়ের অনুরোধই রাখব, চুপ করে থাকব। ওরা হয়তো আমাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বা অকৃতজ্ঞ মনে করবে, তবু মিথ্যে বলার চেয়ে চুপ থাকাই ভাল। মনে হলো বাখন জিয়োখদানোও তাই করবে।

লুইকে কবর দেয়ার ঠিক পাঁচদিন পর। রাত সোয়া এগারোটা। আগুনের ধারে টেবিলে বসে লিখছি। চারদিক চুপচাপ। এমনি সময়ে ঘরে ঢুকল আমার চাকরটা, তড়িঘড়ি দরজা বন্ধ করল, তারপর কাঁপা গলায় বলল, 'মশিয়ে লু-লু-লুই দো ফ্রানশি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান!'

হতভম্ব হয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলাম ওর দিকে: একেবারে ছাইবর্ণ দেখাচ্ছে মুখটা।

'কি বললে, ভিক্তর?' জিজ্ঞেস করলাম।

'মশিয়ে, কী যে বলছি, সত্যি বলতে গেলে, আমি নিজেও জানি না।'

'কে এসেছে বললে?'

'মশিয়ের বন্ধু!' প্রায় ফিসফিস করে বলল ভিক্তর। 'যে মশিয়ে ফ্রানশি ক-কয়েকবার এসেছেন আমাদের বাড়িতে।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! তোমার জানা নেই, পাঁচদিন আগে ডুয়েল লড়তে গিয়ে...'

'জানা আছে, মশিয়ে। উনি মারা গেছেন!' থরথর করে কাঁপছে ভিক্তর, দুচোখ যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

শিরশির করে ভয়ের একটা স্রোত নেমে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে।

'বলো কী!'

'জ্বি, মশিয়ে। বেল বাজতেই দরজা খুলে দেখি উনি দাঁড়িয়ে। এক লাফে পিছিয়ে গেলাম। উনি ঢুকে পড়লেন ভেতরে, জানতে চাইলেন আপনি আছেন কি না। আমি হ্যাঁ বলতেই বললেন, "যাও, ওঁকে বলো মশিয়ে দো ফ্রানশি কথা বলতে চান।" আমি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।'

'প্রলাপ বকছ, ভিকতর। হলঘরে আলো কম, ঠিক মত দেখতে পাওনি; হয়তো ঘুমের ঘোরে ছিলে, ঠিক মত শুনতেও পাওনি। যাও, নামটা ভাল করে জেনে

এসো।'

নড়ল না ও। 'আ-আমি ক-ক্বসম খেয়ে বলছি, মশিয়ে, আমার দেখা বা শোনায় কোনও ভুল হয়নি।'

'ঠিক আছে, তাহলে ওঁকে ভেতরে আসতে বলো।'

কাঁপতে কাঁপতে দরজার কাছে গেল ভিক্তর, দরজাটা সামান্য ফাঁক করে ঘরের ভেতরে থেকেই ডাকল, 'মশিয়ে, দয়া করে ভেতরে আসবেন?'

কার্পেট থাকা সত্ত্বেও পায়ের আওয়াজ পেলাম, এগিয়ে আসছে আমার ঘরের দিকে; পরমুহূর্তে পরিষ্কার দেখতে পেলাম দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে লুই দো ফ্রানশি!

এইবার সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গেল আমার ঘাড়ের কাছে সব কটা চুল। উঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম, পিছিয়ে গেলাম এক পা নিজের অজান্তেই। ভিক্তর সেঁটে আছে দেয়ালের গায়ে।

'এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করছি বলে মাফ করবেন,' বলল ফ্রানশি, 'মিনিট দশেক হলো পৌঁছেছি প্যারিসে। আগামী কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য হলো না, চলে এলাম।'

'আরে! মাই ডিয়ার লুসিয়েন,' ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে। 'তুমি! তুমি এসেছ?' চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল, নিজেকে সামলাতে পারলাম না।

'হ্যাঁ,' বলল ও, 'আমি।'

এই পাঁচদিনে চিঠি পৌঁছানো একেবারেই অসম্ভব। আমার পোস্ট করা চিঠি এতক্ষণে আজাসিওতেই পৌঁছায়নি, সুলাকাখো তো আরও বহুদূর। অর্থাৎ খবর পেয়ে আসেনি ও।

'তার মানে, এখানে কী ঘটে গেছে কিছুই জানো না তুমি।'

'সব জানি,' বলল ও।

'কি বললে? সব জানো?'

'হ্যাঁ।'

'ভিক্তর,' ঘাড় ফিরিয়ে দেখি এখনও দেয়ালে সেঁটে রয়েছে ও, পারলে দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়, 'এখন যাও, পনেরো মিনিটের মধ্যে আমাদের দুজনের জন্যে খাবার নিয়ে আসবে ট্রেতে করে। আমার সঙ্গে সাপার খাবে তুমি, লুসিয়েন; তোমার ঘুমানোর জন্যে বিছানা রেডি করতে বলি?'

'খাব,' বলল লুসিয়েন। 'খিদেও লেগেছে—অগজি থেকে এ-পর্যন্ত খাইনি কিছু। আর থাকতেও হবে এখানেই। কারণ, ভাইয়ের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম, কিন্তু ওখানে কেউ তো আমাকে চেনে না, অথচ ভাবছে চেনে—তাই ঢুকতে দিল না। ওরা ভয় পেয়ে এমন চেঁচামেচি শুরু করে দিল যে পালিয়ে চলে এলাম তোমার এখানে।'

'লুইয়ের সঙ্গে তোমার চেহারার এতই মিল যে ওদের দোষ দেয়া যায় না। একটু আগে আমিও তো চমকে গিয়েছিলাম।'

'তা···ই বলুন!' এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ভিক্তর, 'মশিয়ে তাহলে তাঁর ভাই?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি সাপার তৈরি করতে গেলে না?'

ভিক্তর বেরিয়ে যেতেই লুসিয়েনকে হাত ধরে টেনে একটা আর্মচেয়ারে বসালাম, নিজেও পাশে বসলাম।

'তুমি তাহলে আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিলে, প্যারিসে আসার পথে ওই দুর্ঘটনার সংবাদ পাও?'

'না। আমি তখন সুলাকাখোতে।'

'তা কি করে হয়? তোমার ভাইয়ের লেখা চিঠি তো এখনও না পৌঁছারই কথা,

তার আগেই তুমি কি করে…'

'বন্ধু আলেকজন্দ্রে, তুমি তো জানোই: মৃত মানুষের আত্মা দ্রুত চলে।'

'তোমার কথাটা কিন্তু ঠিক বোঝা গেল না।'

'আমাদের পরিবারের একটা বিশেষত্বের কথা তোমাকে বলেছিলাম, ভুলে গেছ দেখছি। আমরা, পরিবারের পুরুষরা…'

'হ্যাঁ। মনে পড়েছে। তোমার ভাইকে দেখেছ তুমি?'

'ঠিক।'

'কখন?'

'ষোলো তারিখে, রাতে।'

'সব বলল তোমাকে?'

'সব।'

'বলল: মারা গেছে?'

'বলল, খুন করা হয়েছে ওকে। মৃত আত্মা কখনও মিথ্যে বলে না।'

'কিভাবে খুন হয়েছে, তাও বলেছে?'

'ডুয়েলে।'

'যে মেরেছে তার নামও…'

'হ্যাঁ, বলেছে। মশিয়ে দো শাতো-রোনো।'

'এ কী করে হয়!' আমার দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। 'তুমি নিশ্চয়ই ওর বাসায় গিয়ে বা আর কোনভাবে খবরটা শুনেছ?'

'তোমার কি মনে হয় আমি চালিয়াতির মূডে আছি?'

'মাফ করো! তবে যা বলছ তা এতই…'

'অবিশ্বাস্য। বুঝতে পারছি কি বলতে চাও। তবে দেখো,' শার্ট খুলে বুকের ডানদিকটা দেখাল ও। দেখলাম নীল হয়ে আছে একটা জায়গা, পাঁজরের ষষ্ঠ হাড়ের ঠিক নিচে। 'কিছু বুঝলে? ওর জখমটা কোথায় জামা খুলে দেখেছিলে?'

'আশ্চর্য!' এইবার বুকটা কেঁপে গেল আমার, 'ঠিক এই জায়গাটাতেই তো লেগেছিল গুলি!'

'বেরিয়েছিল এখান দিয়ে, তাই না?' বলেই বাম কোমরে আঙুল ঠেকাল।

'অলৌকিক!' একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

'মৃত্যুর সময়টা জানতে চাও?'

'তাও জানো?'

'ন'টা দশ।'

'দাঁড়াও, লুসিয়েন, আমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে চমকে দিচ্ছ তুমি আমাকে। আর সহ্য করতে পারছি না। কিভাবে কি হলো সব খুলে বলো, প্লীজ!'

উনিশ

আর্মচেয়ারে আরাম করে বসল লুসিয়েন। সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'এরমধ্যে আমি তো কোনও অলৌকিকত্ব দেখতে পাচ্ছি না। যেদিন আমার ভাই খুন হলো সেদিন খুব ভোরে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছিলাম, যাব কাখবোনির কাছে আমাদের রাখালদের কাজ দেখাশোনা করতে। চলতে চলতে ঘড়িটা বের করে সময় দেখে যেই পকেটে রেখেছি, অমনি প্রচণ্ড আঘাত লাগল বুকের ডানধারে। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে। যখন চোখ মেললাম, দেখি শুয়ে আছি মাটিতে, আমার চোখে-মুখে পানির ছিটে দিচ্ছে অখলান্দ। গজ চারেক দূরে দাঁড়িয়ে গলা লম্বা

করে আমাকে দেখছে আমার ঘোড়াটা, নাক ঝাড়ছে।

' "ব্যাপার কি," জিজ্ঞেস করল উদ্বিগ্ন অখলান্দ, "কী হলো আপনার?"

"হায় খোদা!" বললাম, "আমি কিছু জানি না। তুমি কি গুলির আওয়াজ পেয়েছ?"

' "নাহ্।"

' "মনে হলো, এই জায়গাটায় গুলি খেলাম।" এই কথা বলে ব্যথার জায়গাটা দেখালাম।

' "প্রথমত, কেউ এখানে বন্দুক বা পিস্তল ফোটায়নি; দ্বিতীয়ত, আপনার কোটে কোনও ফুটো নেই।"

' "তাহলে," বললাম, "খুব সম্ভব এই মাত্র আমার ভাই মারা গেল গুলি খেয়ে।"

' "তা হতে পারে," বলল অখলান্দ, "সেটা সম্ভব।"

'কোট খুলে দাগ দেখে নিশ্চিত হলাম। তখন অবশ্য নীলচে ছিল না দাগটা, ক্ষতচিহ্নের মত দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

'শারীরিক ও মানসিক তীক্ষ্ণ ব্যথায় কিছুক্ষণের জন্যে বেদিশা হয়ে পড়লাম। মনে হলো সুলাকাখোয় ফিরে যাই। কিন্তু মা'র কথা মনে হল। সাপারের সময় বাড়ি ফেরার কথা আমার, আগে ফিরলে কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে, অথচ কোনও ব্যাখ্যা নেই আমার। নিশ্চিত না হয়ে লুইয়ের মৃত্যুসংবাদ দিতে চাইনি আমি মা'কে। তাই সন্ধে ছ'টার আগে আর ফিরলাম না।

'কিছুই সন্দেহ করেনি মা। খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে ফিরতে যাচ্ছি, করিডরে আসতেই বাতাসে নিভে গেল আমার হাতে ধরা মোম।

'নিচে গিয়ে আবার জ্বেলে আনব ভেবে ঘুরতে গিয়েই লক্ষ করলাম আমার ভাইয়ের ঘরে আলো জ্বলছে, দরজার ফাঁক-ফোকর দিয়ে কয়েক চিলতে আলো দেখা যাচ্ছে।

'মনে করলাম, কোনও কাজে ঘরে ঢুকেছিল হয়তো গ্রিফো, ভুলে আলোটা ফেলে রেখে গেছে।

'দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখলাম, লুইয়ের বিছানার পাশে মোমদানিতে ছোট্ট একটা মোমবাতি জ্বলছে, বিছানায় শুয়ে রয়েছে লুই, রক্ত ঝরছে নগ্ন বুক থেকে।

'এক মুহূর্তের জন্যে মূর্তির মত জমে গেলাম ভয়ে, তারপর কাছে গেলাম।

'ছুঁলাম ওকে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে শরীরটা।

'আমি ঠিক যে জায়গাটাতে ব্যথা পেয়েছি, ঠিক সেখান দিয়েই শরীরে ঢুকেছে গুলি। বেগুনী হয়ে আসা জখমের ফাঁক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত চুয়াচ্ছে।

'আমার ভাই যে খুন হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ থাকল না।

'হাঁটুতে ভর দিয়ে চোখ বুজে মাথাটা রাখলাম বিছানায়। প্রার্থনা করলাম।

'প্রার্থনা শেষে চোখ মেলে দেখি ঘুটঘুটে অন্ধকার, মোমবাতি গায়েব। বিছানা হাতিয়ে দেখলাম, খালি।

'আমি নিজেকে যথেষ্ট সাহসী বলে মনে করি, কিন্তু সেদিন ওর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে অনুভব করলাম, মাথার চুল দাঁড়িয়ে গেছে, ঘামে ভিজে গেছে শরীর।

'আরেকটা মোমবাতি নেয়ার জন্যে নিচে গেলাম; আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল মা।

' "কী হয়েছে, লুসিয়েন," কাছে এসে জিজ্ঞেস করল মা। "এমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?"

' "কই, কিছু না তো!" বললাম।

'আরেকটা মোমবাতি নিয়ে ওপরে উঠে এলাম। এবার আর নিভল না বাতি, আমার ভাইয়ের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম···কেউ নেই। মোমদানি গায়েব, খাটের তোশকে কোথাও কোন চাপ পড়েনি। আমার প্রথম মোমবাতিটা দেখলাম পড়ে আছে মেঝেতে। তুলে নিয়ে জ্বাললাম ওটাও।

'নতুন করে কোনও প্রমাণ পাওয়া না গেলেও, আমার মনে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকল না: সকাল ন'টা বেজে দশ মিনিটের সময় খুন হয়েছে আমার ভাই।

'নিজের ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকলাম। অনেক, অনেকক্ষণ পর ক্লান্তিতে ঘুম নামল আমার চোখে।

'এবার স্বপ্নে দেখতে পেলাম পুরো দৃশ্যটা, ঠিক যেভাবে যা ঘটেছে। যে-লোকটা ওকে খুন করেছে, তাকে দেখলাম; শুনলাম, ওকে মশিয়ে দো শাতো-রোনো বলে ডাকা হচ্ছে।'

'হায় হায়! সব দেখেছ ঠিকঠিক!' বলে উঠলাম। 'কিন্তু প্যারিসে এসেছ কেন?'

'আমার ভাইকে যে হত্যা করেছে, তাকে খুন করতে।'

'খুন করতে?'

'দুশ্চিন্তা কোরো না, কর্সিকানদের মত ঝোপের পিছন বা দেয়ালের আড়াল থেকে নয়; ফরাসীদের মত সাদা দস্তানা, ঝালর ও কুঁচি দেয়া আস্তীন লাগানো কারুকাজ করা শার্ট পরে খুন করব ওকে।'

'মাদাম দো ফ্রানশি জানেন তুমি কি করতে এখানে এসেছ?'

'জানে।'

'উনি তোমাকে অনুমতি দিলেন?'

'আমার কপালে চুমো খেয়ে বলল: যাও। আমার মা তো একজন সত্যিকার কর্সিকান।'

'এবং তুমি চলে এলে!'

'এসে গেছি। বিশ্বাস না হয় ছুঁয়ে দেখো।'

'তোমার ভাই কিন্তু চায়নি তুমি প্রতিশোধ নিতে ছুটে আসো।'

'তাই বুঝি?' তিক্ত হাসি হাসল লুসিয়েন। 'মৃত্যুর পর মত পরিবর্তন করেছে ও নিশ্চয়ই।'

এমনি সময় সাপার নিয়ে ঘরে ঢুকল ভিক্‌তর, আমরা বসে পড়লাম টেবিলে।

নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে খেল লুসিয়েন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে ওর ঘরে পৌঁছে দিলাম ওকে। আমার হাত ধরে শুভরাত্রি কামনা করল। প্রচণ্ড মানসিক শক্তি থাকলেই কেবল মানুষকে এমন একটা অটল সিদ্ধান্ত নেয়ার পরও এমন শান্ত দেখায়।

পরদিন সকালে আমি তৈরি হতেই এসে হাজির হলো লুসিয়েন।

'ভানসাঁ-এ যাব ওর মৃত্যুস্থানটা জিয়ারত করতে,' বলল ও, 'তুমি যাবে আমার সঙ্গে? তোমার সময় না থাকলে আমি নাহয় একাই ঘুরে আসি।'

'একা? একা তুমি যাবে কি করে? তুমি জায়গাটা চেনো?'

'ভাল করেই চিনি। স্বপ্নে দেখেছি আমি ওটা।'

আন্দাজে আন্দাজে কতদূর ও যেতে পারে দেখার আগ্রহ হলো।

'আমিও সঙ্গে থাকব তোমার,' বললাম।

'বেশ তো, তুমি তাহলে তৈরি হয়ে নাও; আমি ততক্ষণে জিয়োখদানোকে একটা চিঠি লিখে ফেলি। তোমার চাকরটাকে পাঠানো যাবে তো ওর বাসায়?'

'নিশ্চয়ই। তুমি যা বলবে ও তাই করবে।'

'ধন্যবাদ।' নিজের ঘরে চলে গেল লুসিয়েন।

দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল চিঠি হাতে, ভিক্‌তরকে ওটা দিয়ে বুঝিয়ে দিল কার কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

একটা গাড়ি ডেকে ভানসাঁ-এর উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম।

ক্রস রোডে পৌঁছতেই লুসিয়েন বলল, 'কাছাকাছি চলে এসেছি, তাই না?'

'হ্যাঁ, জঙ্গলে ঢোকার রাস্তাটা এখান থেকে আর বড়জোর বিশগজ দূরে।'

'এই যে, এইখানে থামো!' বলে উঠল লুসিয়েন।

কোনও রকম দ্বিধা না করে জঙ্গলে প্রবেশ করল লুসিয়েন, যেন কতবার এসেছে এখানে। সোজা গিয়ে সেই ছোট্ট মাঠের ধারে দাঁড়াল ও, এদিক-ওদিক চেয়ে দিক বুঝে নিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়াল ঠিক যেখানে পড়েছিল লুই, সেখানে। নিচু হয়ে ঝুঁকে লাল দাগ খুঁজে পেল মাটিতে, বলল, 'এই সে-জায়গা।' ধীর ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে চুমো খেল সে ঘাসের চাপড়ায়।

এবার উঠে মাঠের ওপর দিয়ে সোজা হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল সে যেখানে দাঁড়িয়ে গুলি করেছিল মশিয়ে দো শাতো-রোনো। 'আর এইখানে দাঁড়িয়েছিল ও,' পা দিয়ে আঘাত করল জমিতে, 'আগামীকাল ঠিক এখানেই শুয়ে থাকতে দেখবে ওকে।'

'কী বলছ তুমি? আগামীকাল…'

'হ্যাঁ। যদি কাপুরুষ না হয়, আগামীকাল ও আমাকে সুযোগ দেবে প্রতিশোধ নেয়ার।'

'বন্ধু লুসিয়েন,' বললাম, 'ফরাসী রেওয়াজ বলে: ডুয়েলের ফলাফল ওই ডুয়েলেই সীমাবদ্ধ—লড়াই শেষ হলেই শেষ। একে আর টেনে লম্বা করা যাবে না। তোমার ভাইকে চ্যালেঞ্জ করেছিল মশিয়ে দো শাতো-রোনো, তার সঙ্গে লড়েছে; এটা তোমার কোনও ব্যাপার নয়।'

'তাই বুঝি? ফরাসী রেওয়াজ বলে: যেহেতু আমার ভাই এক ভদ্রমহিলাকে তাঁরই অনুরোধে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল, যে মহিলাকে মশিয়ে দো শাতো-রোনো বেশ্যা বলে প্রমাণ করতে যাচ্ছিল বন্ধু-বান্ধবের কাছে; সেইহেতু আমার ভাইকে চ্যালেঞ্জ করে খুন করবার অধিকার ছিল মশিয়ে দো শাতো-রোনোর! যে ভাই আমার জীবনে কোনদিন পিস্তল ছুঁয়ে দেখেনি, তার তরফ থেকে কোনও রকম বিপদের আশঙ্কা নেই জেনে নিশ্চিন্তে তাকে পাখি শিকারের মত গুলি করে হত্যা করেছিল; সেই লোককে আমার চ্যালেঞ্জ করবার কোনও অধিকার নেই? ধিক্ তোমাদের ফরাসী রীতি! আমি এ অন্যায় মানব কেন?' একটু থেমে নরম কণ্ঠে বলল, 'দেখা যাক না, কি হয়।'

মাথা ঝাঁকালাম আমি শুধু, ওর কথার জবাব দিতে পারলাম না।

'যাই হোক,' বলল লুসিয়েন, 'এসবের সঙ্গে তোমার জড়িয়ে কাজ নেই, আলেকজন্দ্রে। তোমার বিব্রত বোধ করবারও কোনও কারণ নেই। জিয়োখদানোকে আমি জানিয়েছি কি করতে হবে; আমরা প্যারিসে ফিরতে ফিরতে আশা করি সব ব্যবস্থা করে ফেলবে ও। তোমার কি মনে হয় মশিয়ে দো শাতো-রোনো আমার চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে যাবে?'

'আমার মনে হয়, সাহসের কমতি নেই ওর।'

'সেটা খুব ভাল কথা,' বলল লুসিয়েন, 'চলো, এবার লাঞ্চ সেরে নিই।'

অ্যাভিনিউয়ে ফিরে গাড়িতে উঠলাম, বললাম, 'ড্রাইভার, রু দো রিভোলি।'

'না,' বলল লুসিয়েন, 'আমি লাঞ্চ খাওয়াব। ড্রাইভার, কাফে দো পাখি চলো। লুই ওখানে প্রায়ই খেতে যেত না?'

'মনে হয়।'

'তাছাড়া, ওখানেই আমি জিয়োখদানোকে আসতে বলেছি।'

'ঠিক আছে। কাফে দো পাখিই সই।'

আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম রেস্তোরাঁর সামনে।

বিশ

লুইয়ের মৃত্যুসংবাদ, বোঝা গেল, এখানে পৌঁছে গেছে আগেই— লুসিয়েনকে দেখে থতমত খেয়ে গেল রেস্তোরাঁর সবাই। আমি একটা প্রাইভেট ঘর চাইলাম। পিছন দিকে একটা কামরা দেয়া হলো আমাদের।

শান্ত, নিরাসক্ত ভঙ্গিতে খবরের কাগজে মন দিল লুসিয়েন। লাঞ্চের মাঝামাঝি সময়ে জিয়োখদানো এসে ঢুকল।

চার-পাঁচ বছর দেখা নেই দুই কর্সিকানের, অথচ কোনও উচ্ছ্বাস দেখলাম না কারও মধ্যে, হ্যান্ডশেক করেই বসে পড়ল জিয়োখদানো। বলল, 'সব ঠিক করে এলাম।'

'চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন তাহলে মশিয়ে দো শাতো-রোনো?'

'হ্যাঁ। তবে শর্ত দিয়েছেন, এরপর তোমরা তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেবে।'

'এ ব্যাপারে তাঁকে ভাবতে হবে না। আমিই শেষ ফ্রানশি। সরাসরি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছ, না তাঁর সেকেন্ডদের সঙ্গে?'

'সরাসরি। তিনিই তাঁর সেকেন্ড মশিয়ে দো বোয়াসি আর মশিয়ে দো শাতোগ্রঁকে জানিয়ে দেবেন। অস্ত্র, সময় ও স্থান যা ছিল তাই থাকবে।'

'বাহ্, চমৎকার···বসে পড়ো, লাঞ্চ খাও।'

বসল বাখন। আমরা ডুয়েল বাদ দিয়ে অন্যান্য নানান বিষয়ে আলাপ করলাম।

লাঞ্চ শেষ হতেই লুসিয়েন অনুরোধ করল, যে পুলিস অফিসার তার ভাইয়ের জিনিসপত্র সীল করেছেন তাঁর এবং ফ্ল্যাটের মালিকের সঙ্গে যেন তাকে পরিচয় করিয়ে দিই। আজকের রাতটা সে লুইয়ের ঘরে কাটাতে চায়।

প্রায় সারাটা দিনই লেগে গেল এসব ব্যবস্থা করতে। বিকেল পাঁচটায় তার ভাইয়ের ঘরে গিয়ে ঢুকল লুসিয়েন। ওকে ওখানে রেখে চলে এলাম আমরা। শোকের জন্যে একাকীত্বের প্রয়োজন আছে।

পরদিন সকাল আটটায় পৌঁছবার অনুরোধ করল লুসিয়েন, বলল, যদি সম্ভব হয় তাহলে যেন ওই একই পিস্তল সংগ্রহের চেষ্টা করি, সম্ভব হলে যেন কিনে নিই ওগুলো।

তখুনি ডেভিসিন-এ গিয়ে ছয়শো ফ্রাঁ দিয়ে কিনে নিলাম পিস্তল দুটো। মনের চোখে দেখলাম পিস্তল দুটো ঝুলছে লুসিয়েনের জাদুঘরে—ইতিহাস হয়ে গেছে। একটা খুন করেছিল লুসিয়েনের ভাই লুই দো ফ্রানশিকে, অপরটা নিয়েছিল তার বদলা। অলীক কল্পনা অবশ্য দূর করে দিলাম মন থেকে।

পরদিন ঠিক পৌনে আটটায় পৌঁছে গেলাম লুসিয়েনের ঘরে। স্টাডিরুমে ঢুকে দেখলাম লুইয়ের মত ঠিক সেই একই ভঙ্গিতে বসে কি যেন লিখছে লুসিয়েন। আমাকে দেখে হাসল, কিন্তু চেহারাটা ছাইবর্ণ, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

'এসো, আলেকজন্দ্রে,' বলল ও, 'মা'কে লিখছি।'

'দুঃসংবাদ নয় তো?'

'না। লিখছি, লুইয়ের জন্যে নিশ্চিন্ত মনে এখন থেকে দোয়া করতে পারবে—ওর আত্মা আর অশান্তিতে নেই; খুনের বদলা নেয়া হয়েছে।'

'ডুয়েল শেষ হলে পোস্ট করবে?'

'না, এখনই; এখন পোস্ট করলে কয়েক ঘণ্টা আগে পৌঁছবে।'

'কিন্তু··· কিন্তু নিশ্চিত না হয়ে কি এরকম একটা চিঠি মাকে লেখা উচিত?'

হাসল লুসিয়ে। 'আমি নিশ্চিত।'

'তবু। ডুয়েলের কথা কি আগে থেকে বলা যায়? মা'কে কিছু জানানোর আগে...'

'কেন, কি ঘটবে আমার ভাই আগে থেকে বলেনি তোমাকে?' উঠে দাঁড়াল লুসিয়েন, তর্জনী রাখল আমার কপালে। 'ঠিক এই জায়গায় লাগাব গুলি।' কথাটা বলেই ঘণ্টা বাজাল।

ঘরে ঢুকল জোসেফ।

'দৌড়ে গিয়ে এ-চিঠিটা পোস্ট করে এসো তো, জোসেফ।' ছুটল ভৃত্য।

একটু পরেই বাখন জিয়োখদানো এসে পড়ল। ঘড়িতে দেখলাম আটটা বাজে। লুসিয়েনের তাগাদায় দেরি না করে রওনা হয়ে গেলাম। পথে কোচম্যানকে ও এতই তাড়া দিল যে দশ মিনিট আগেই পৌঁছে গেলাম নির্দিষ্ট জায়গায়।

ঠিক নয়টায় পৌঁছল আমাদের প্রতিপক্ষ। ঘোড়ায় চড়ে এসেছে তিনজনই। অপর একটা ঘোড়ায় করে সহিস এসেছে ঘোড়ার দেখাশোনা করার জন্যে।

গজ বিশেক দূরে নামল ওরা ঘোড়া থেকে, সহিসের হাতে লাগাম ধরিয়ে দিয়ে ধীর পায়ে আসছে এদিকে। সবার পিছনে মশিয়ে দো শাতো-রোনো, ডানহাতটা ঢুকিয়ে রেখেছে কোটের ভেতর। লক্ষ করলাম লুসিয়েনের ওপর চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল শাতো-রোনো, মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখটা। চট্ করে ঘুরে চাবুক চালিয়ে খেলাচ্ছলে ঘাসফুলের মাথা কাটায় মন দিল।

'আমরা উপস্থিত, মেসিয়া,' ঘোষণার ভঙ্গিতে বলল মশিয়ে দো শাতোগ্রঁ ও মশিয়ে দো বোয়াসি। 'গতবারের মত একই নিয়মে হবে এবারের ডুয়েল। তবে শর্ত এই যে, ফলাফল এদিক বা ওদিক যাই হোক না কেন, মশিয়ে দো শাতো-রোনোকে সেজন্যে কোনও অবস্থাতেই দায়ী করা যাবে না।'

'আমরা রাজি,' বললাম আমরা।

লুসিয়েনও মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানাল।

'অস্ত্র এনেছেন, মেসিয়া?' ভাসকাঁ দো শাতোগ্রঁ জানতে চাইল।

'ওই আগেরগুলোই।'

'মশিয়ে লুসিয়েন দো ফ্রানশি এগুলোর কোনটা ব্যবহার করেছেন?'

'না। বরং মশিয়ে দো শাতো-রোনো এর একটা ব্যবহার করেছেন একবার। ইনি এগুলো এখন পর্যন্ত চোখেও দেখেননি।'

'ভাল কথা, মেসিয়া। এসো, শাতো-রোনো, চলো যাই।'

নীরবে এগোলাম আমরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। সামনের মঞ্চে সাতদিন আগেই যে নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার টুকরো টুকরো দৃশ্য ভেসে উঠছে আমাদের সবারই মনে। আজও সেই একই রকম ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটবে প্রতিপক্ষের একজনের ভাগ্যে, বুঝতে পারছি।

ছোট্ট মাঠে এসে পৌঁছলাম।

প্রচণ্ড মানসিক শক্তি খাটিয়ে নিজেকে শান্ত রেখেছে মশিয়ে দো শাতো-রোনো। বাইরে থেকে শান্ত দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু আমরা যারা গত ডুয়েলে উপস্থিত ছিলাম, তফাৎটা ঠিকই টের পেলাম। ভেতর ভেতর ঘেমে নেয়ে উঠেছে লোকটা, বারবার রুমাল ঘষছে গলায়, কপালে। যতবার লুসিয়েনের দিকে তাকাচ্ছে, ততবারই ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠছে দৃষ্টিতে। আত্মবিশ্বাস ধূলিসাৎ হয়ে গেছে লোকটার, সন্দেহ নেই।

দু'ভাইয়ের চেহারায় অস্বাভাবিক মিল হয়তো ঘাবড়ে দিয়েছে লোকটাকে, হয়তো ভাবছে, প্রতিশোধ নিতে ফিরে এসেছে স্বয়ং লুই দো ফ্রানশির আত্মা। কিংবা এমন কি হতে পারে, খোঁজ নিয়ে জেনেছে লুইয়ের মত আনাড়ি লোক নয় লুসিয়েন, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর দক্ষ একজন পিস্তল শূটার? সন্দেহটা অমূলক মনে

হচ্ছে না এখন। গতবারের সেই সাবলীল, নিরুদ্বেগ ভঙ্গি ওর কোথায় গেল এবার?

পিস্তলগুলো যখন লোড করা হচ্ছে, তখন দেখলাম কোটের ভেতর থেকে হাত বের করল লোকটা, হাতটা স্থির রাখার জন্যে ভেজা ন্যাকড়া জড়িয়ে রেখেছিল এতক্ষণ।

লুসিয়েনের দিকে তাকালাম। শান্ত, নিশ্চিত ভঙ্গি ওর, দৃষ্টি স্থির।

কেউ কিছু বলার আগেই লুই যেখানে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল লুসিয়েন; ফলে মশিয়ে দো শাতো-রোনোকে নিজের গতবারের জায়গায় গিয়েই দাঁড়াতে হলো।

হাসিমুখে নিজের অস্ত্র নিল লুসিয়েন।

মশিয়ে দো শাতো-রোনোর মুখে হাসি তো দূরের কথা, অস্ত্র নেয়ার সময় মনে হলো ফ্যাকাসে মুখের জায়গায় জায়গায় নীলচে ছোপ পড়েছে। যেন দম আটকে আসছে, এমনি ভঙ্গিতে কলারের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে টেনে-টুনে ঢিল করার চেষ্টা করল। যেন হাঁসফাঁস করছে প্রাণটা।

লোকটার দিকে চেয়ে আমার খারাপই লাগল। স্বাস্থ্যবান, ধনী, সুবেশী, লেডি-কিলার যুবক, যে কি না গতকাল সকালেও জানত আরও বহু বছর বাঁচবে, আনন্দ-ফুর্তি করবে। অথচ আজ সকালে কলজে শুকিয়ে এসেছে তার, ঘাম মুছছে ভুরু থেকে, চোখে মৃত্যুভীতি।

'আপনারা তৈরি, মেসিয়া?' জানতে চাইল মশিয়ে দো শাতোগ্রঁ।

'তৈরি,' গমগমে কণ্ঠে জবাব দিল লুসিয়েন।

মশিয়ে দো শাতো-রোনো মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল।

আমি আর তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। চট্ করে পিছনে ফিরলাম।

পরপর দু'বার হাততালির শব্দ এল কানে, তৃতীয় তালি চাপা পড়ে গেল দুই পিস্তলের শব্দের নিচে।

ঘুরলাম।

দেখি, মশিয়ে দো শাতো-রোনো পড়ে আছে মাটিতে, অনড়—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলা বা সামান্যতম নড়াচড়ারও সুযোগ পায়নি; আগেই বেরিয়ে গেছে প্রাণ।

অপরদিকে পিছনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে লুসিয়েন, দৃষ্টি আকাশের দিকে। খুব সম্ভব প্রার্থনা করছে ভাইয়ের আত্মার শান্তির জন্যে।

প্রথমে মৃতদেহের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, আমার কপালের যেখানটায় তর্জনী ঠেকিয়েছিল লুসিয়েন, লাশের কপালে ঠিক সেখান দিয়েই ঢুকেছে গুলি।

লুসিয়েনের দিকে এগোলাম।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সে শান্ত ভঙ্গিতে, পিছনে হাত বাঁধা। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই পিস্তল ফেলে দিয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে।

'ভাই রে, ও আমার ভাই রে!' বুক ফাটা আর্তনাদ বেরোল লুসিয়েনের কণ্ঠ চিরে।

তারপর ভেঙে পড়ল অদম্য কান্নায়। অঝোরে ঝরছে তার চোখের পানি।

ভাইয়ের মৃত্যুর পর এই প্রথম পানি বেরোল ওর চোখ দিয়ে।

* * *

আলেকজান্দার দ্যুমা-র

দ্য কর্সিকান ব্রাদার্স

ভাষান্তর: কাজী আনোয়ার হোসেন

কর্সিকান এক বনেদী পরিবারে জন্ম যমজ দুই ভাই
লুসিয়েন ও লুই দো ফ্রানশির।
চেহারায় এতই মিল যে ছোটবেলায় ওদের মা পর্যন্ত
কোন্‌টা কোনজন চেনার জন্যে জামায়
চিহ্ন দিয়ে রাখতে বাধ্য হতেন।
দেখতে এক হলে কি হবে, দুজনের মন-মানসিকতা
সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন বুনো স্বভাবের খাঁটি কর্সিকান,
অন্যজন ফরাসী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।
একজনের সখ্যতা বন্দুক-পিস্তল-ছোরার সঙ্গে;
অন্যজনের প্রেম দর্শন-ইতিহাস-কবিতার সঙ্গে।
কিন্তু পরস্পরের প্রতি ভালবাসায় কোন খাদ নেই।
বিপরীত চরিত্রের এই দুই ভাইকে নিয়েই বিশ্বখ্যাত
কথা সাহিত্যিক আলেকজান্দার দ্যুমার অমর সৃষ্টি:
দ্য কর্সিকান ব্রাদার্স।
অসংক্ষেপিত।